জুলাই ২০২০ ❑ আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৭
নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের
সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা
মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100
রিমঝিম বর্ষা

মো. জীম, প্রথম শ্রেণি, পাইকগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খুলনা

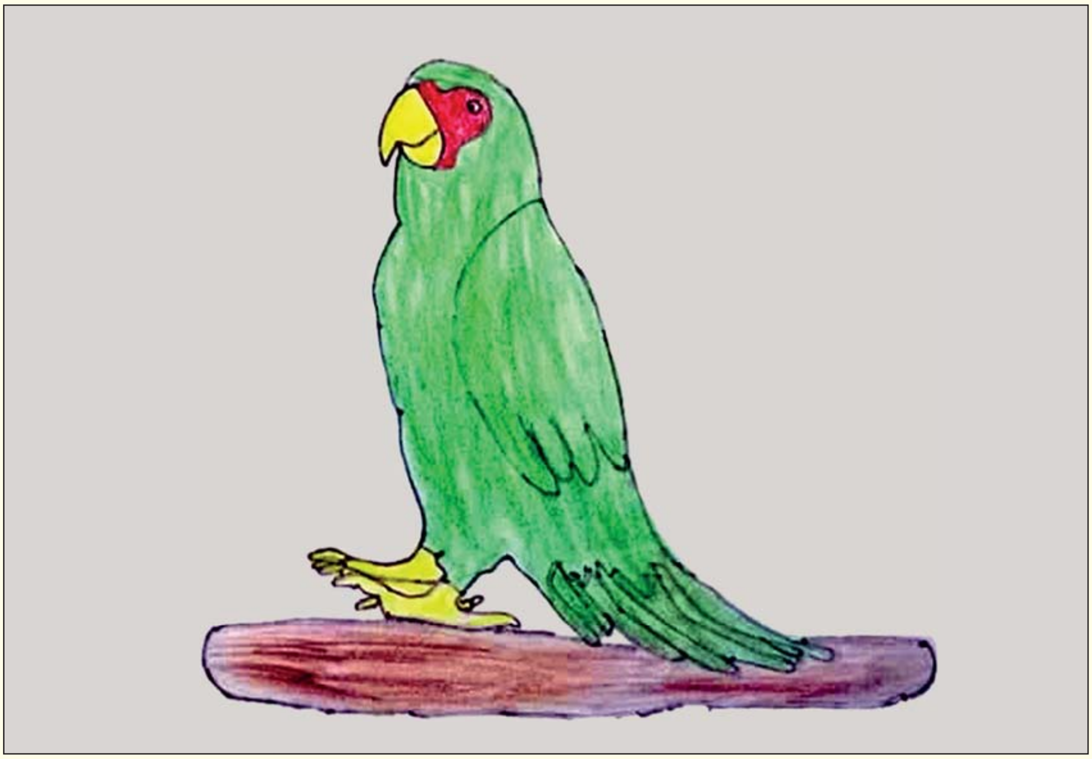

মেহজাবিন চৌধুরী, পঞ্চম শ্রেণি, দোঘর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চাঁদপুর

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

জুলাই ২০২০ ❑ আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৭

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
মোহাম্মদ আলী সরকার

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সম্পাদকীয়

কেমন আছো বন্ধুরা? করোনাকালীন এই সময়ে তোমাদের হাতে এখন অফুরন্ত সময়। তার মধ্যে আবার বর্ষাকাল। বর্ষাকাল তো ঘরে থাকারই কাল।

ঋতু হিসেবে আষাঢ়-শ্রাবণ দুই মাস বর্ষাকাল। আর প্রিয় ঋতু বর্ষার প্রথম মাস আষাঢ়। বাঙালির জীবনে আষাঢ় মানেই বৃষ্টি মুখর দিন। সেই সঙ্গে ভেজা স্নিগ্ধ শীতল শিহরণ, মাতাল হাওয়া। মনপ্রাণ আনচান করে ওঠার দিন। কবিগুরু এ মাসের প্রকৃতিকে বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন।

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে।

ওগো, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে...!

বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু ঘরে বসেই এই সময়টাকে উপভোগ করবে। ভালো ভালো বই পড়বে। সাথে সাথে ক্লাসের পড়াশুনাও চালিয়ে যাবে। যাতে সিলেবাস শেষ করতে পারো।

এ সময় জলীয়বাষ্পবাহী দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। নিয়মিত বৃষ্টির ফলে বদলে যেতে থাকে পরিবেশ। টানা বর্ষণে মাটি উর্বর হয়, রস পায়। হরেক রকম ফল হয়। বাহারি ফুলের ঘ্রাণে চারপাশ ভরে ওঠে।

এ সময় ঘরে বসে ভাবতে থাকো বন্ধুরা। ভাবতে ভাবতে লিখে ফেল গল্প, কবিতা। এঁকে ফেল কল্পনার নানা রঙে সাজানো ছবি। দেরি না করে আগামী আগস্টের মাঝেই তোমার ছোটোবেলা নিয়ে লেখা আর আঁকা ছবি পাঠিয়ে দাও নবারুণের ঠিকানায়।

ভালো থেকো বন্ধুরা। সাবধানে থেকো সবাই। তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা।

সূচি

নিবন্ধ

০৩ রিমঝিম বর্ষা/মিয়াজান কবীর
০৬ আঙিনায় জাতীয় ফুল/আবদুল খালেক খান
০৮ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে স্মারক বৃক্ষ/ বাদল রহমান
১০ কদম ফুল: প্রকৃতির অলঙ্কার/অ আ আবীর আকাশ
১৫ জন্ম নিবন্ধন দিবস/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৪৯ বর্ষায় থাকি সচেতন/ মেজবাউল হক
৫০ শতবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/শাহানা আফরোজ
৫৪ আমাদের গিরিখাত/নুরুল ইসলাম বাবুল
৫৭ বিশ্ব রসিকতা দিবস/প্রসেনজিৎ কুমার দে
৫৮ জেনে নেই মজার কিছু তথ্য/শাহনাজ সুলতানা
৫৯ স্থূলতায় করণীয়/মো. জামাল উদ্দিন
৬০ ডিজিটাল রঙিন ঘুড়ি আকাশে/সাদিয়া ইফফাত আঁখি
৬১ করোনায় নারী ও কিশোরীদের সুরক্ষা/জান্নাতে রোজী
৬২ বুদ্ধিতে ধার দাও/নাদিম মজিদ
৬৪ বুদ্ধিতে ধার দাও জুন ২০২০ -এর সমাধান

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবিতা

১২ নুসরাত জাহান/ আহনাফ সিদ্দিকী

ভাষা দাদু

২৫ সংখ্যার খেলা/তারিক মনজুর

ছোটোদের লেখা

৪৬ বুলবুলি ও দুটো ছানা/রকিয়া জান্নাত রুমা

গল্প

১৬ ক্যাপটেন শুভমের লকডাউন/পরীক্ষিৎ চৌধূরী
২০ সৃজনের সিদ্ধান্ত/বিশ্বজিৎ সেন
২৩ বৃষ্টিতে ভেজা/লিটন ঘোষ জয়
২৮ ঘুড়ি ওড়ার আনন্দে/জুয়েল আশরাফ
৩৪ টিকলু টোকাই/মিজানুর রহমান মিথুন
৩৬ ছোটো সাহেবের অসুখ/জনি হোসেন কাব্য
৩৮ খাঁচার পাখি/কবির মাহমুদ
৪১ পুতুল বিয়ে/মীম নোশিন নাওয়াল খান
৪৪ গুমনামা/সায়েরে নাজাবি সায়েম
৫৬ এক যে ছিল রাজা/নাসিম সুলতানা

কবিতা

৫ প্রিয়াস আলম
১৩ মো. হাসান মাসুদ/ আরিফুল ইসলাম সাকিব
১৪ তাহমিদ হোসেন/ মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম ফকির
৩১ ফারুক হোসেন / সোহরাব পাশা
৩২ রাকিব আজিজ/ আলম শামস
৩৩ ড. নূরুল হুদা মামুন/ তরুণ ইউসুফ/মো. মেহরাব হোসেন

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ
মো. জীম/ মেহজাবীন চৌধুরী
১১ অনিয়া হক
২২ সুজানা চৌধুরী
২৭ মো. ফাহমিদ হাসান সিয়াম
৪৩ মাইমুনা আক্তার রাফি
৪৮ মুশফিকা ফারাহ
৫৫ আনিসা চৌধুরী

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (Nobarun Potrika) আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

নিবন্ধ

রিমঝিম বর্ষা

মিয়াজান কবীর

ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। ছয় ঋতুর ছয় রূপ। প্রতিটি ঋতু তার আপন শোভায় শোভিত হয়ে বাংলার রূপকে করে বৈচিত্র্যময়। ঋতুর আগমনে রূপের ঐশ্বর্যে ভরে ওঠে বাংলার বন-বনানি-বৃক্ষলতা-তরুবীথি-পথঘাট-প্রান্তর। এক ঋতু যায় আরেক ঋতু রূপের ডালি নিয়ে হাজির হয় বাংলার দ্বারপ্রান্তে। রূপসী বাংলার রূপে মুগ্ধ হয়ে কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে–

‘এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।’

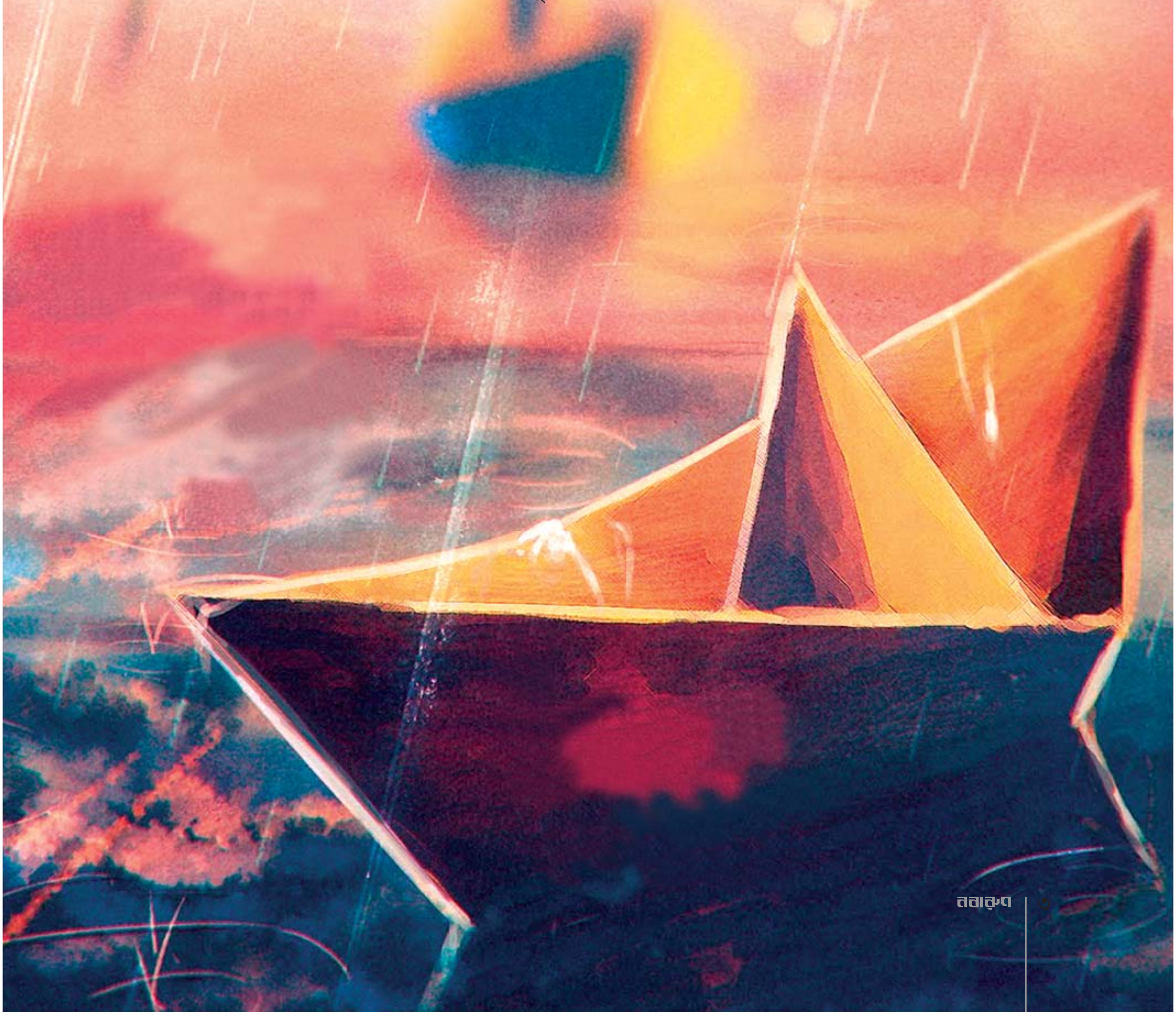

গ্রীষ্মের তাপদাহে বাংলার শ্যামল মাটি যখন চৌচির হয়ে যায়। সবুজ পত্র-পত্রালি বিবর্ণ মলিন হয়ে পড়ে। জল পিপাসায় কাতর হয়ে চাতক পাখি 'ফুট্টি দাও, ফুট্টি দাও' বলে আর্তনাদ করে; ঠিক তখনই দূর-দিগন্ত আকাশের বুকে বাতাসে ভেসে বেড়ায় কালো মেঘমালা। আকাশের বুকে চলে মেঘ-বিদ্যুতের চমকানো খেলা। এমন সময় হঠাৎ শোঁ শোঁ শব্দে ছুটে আসে দূরন্ত হাওয়া। হাওয়ার প্রবল ঝাপটায় বাংলার বুকে ঝরে পড়ে অঝোর ধারায় বর্ষার বৃষ্টি। বাংলার পথ-প্রান্তর, নদী-নালা, খাল-বিল ভরে ওঠে বর্ষার প্রবল বর্ষণে। রিমঝিম বৃষ্টিতে গাছে গাছে ফোটে কদম, কেয়া, কেতকী, জুই, চামেলি, টগর, বেলি, হাসনাহেনা। পুকুরে শাপলা, কলমিলতা ফুলের শোভা মোহনীয় ও আকর্ষণীয় করে তোলে বাংলার রূপ লাবণ্যকে। বর্ষার বিচিত্র ফুলের বনে ফোটা ফুলের গন্ধে আকুল করে হৃদয়-মন। ফুলের গন্ধে বিমোহিত হয়ে ছুটে বেড়ায় প্রজাপতি-মৌমাছি। তাই বুঝি কবির কবিতায় ফুটে উঠেছে এক মনোমুগ্ধকর বর্ষার চিত্র

'গুরু গুরু ডাকে দেয়া
ফুটেছে কদম কেয়া
ময়ূর পেখম সুখে তান ধরছে
বর্ষার ঝর ঝর সারাদিন ঝরছে।'

বর্ষার বৃষ্টিতে আনন্দে নেচে ওঠে চখাচখি, বলাকারা। আকাশে কালো মেঘের আভাসে ময়ূর পেখম মেলে। ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ডাকে মুখর হয়ে ওঠে জলাধার। মাছরাঙা পাখি ঘুরে ফিরে মাছ শিকারের আশায়। আধডোবা বাঁশের কঞ্চির উপর বসে মাছ শিকারের ধ্যানে প্রহর গুণে। সুযোগ মতো ছুঁ মেরে মাছ ধরে উড়াল দিয়ে চলে যায় দূর-দিগন্তে।

বেদেরা নৌকায় চুড়ি, রঙিন ফিতা, ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের হরেক রকম খেলনা সাজিয়ে ফিরে ঘাটে ঘাটে। বিকিকিনি করে পল্লিগ্রামে। এ যেন বাংলার এক চিরন্তন রূপ।

মাকড়সার জালের মতো ঘিরে রয়েছে বাংলার নদ-নদী। বর্ষার জলে নদীগুলো দুকূল ছাপিয়ে ওঠে। নদীর বুকে জাগে বান আর হয়ে ওঠে দুরন্ত-দুর্বার-চঞ্চল। কলকল ছলছল রবে বয়ে চলে ভাটির পানে। মাঝিমাল্লা উজান-ভাটি পথ চলে ছলাৎ ছলাৎ বৈঠা বেয়ে ঢেউয়ের তালে তালে ভাটিয়ালি গান গেয়ে ছুটে বেড়ায় দেশ থেকে দেশান্তরে।

গ্রামবাংলায় বর্ষাকালে চলাচলের একমাত্র বাহন হয়ে ওঠে নৌকা। এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে আসা-যাওয়ায় কলা গাছের ভেলায় কিংবা নৌকায় চড়ে যেতে হয়। এ সময় গাঁয়ের বধূ ছইঅলা নৌকায় বাপের বাড়ি নাইওর যায়। কেউ যায় কুটুম বাড়ি। এ যেন বাংলার শাশ্বত রূপ।

বর্ষায় গ্রামবাংলার মানুষের হাতে তেমন কোনো কাজ থাকে না। অবসর জীবনযাপন করে। দলবেঁধে গল্প করে, কিচ্ছা-কাহিনি শুনে দিন কাটায়। বাড়ির উঠানে বসে গানের আসর। জলতরঙ্গে ভেসে আসে গানের সুর সাথে একতারা দোতারার টুনটুন শব্দের ঝংকার। আবার কখনো সবাই মিলে নৌকা বাইচের আয়োজন করে। নৌকা বাইচের দৃশ্য বাংলাদেশের বর্ষাকে করে তুলে আরও রূপময়। নৌকা বাইচের অপরূপ দৃশ্য দেখে বিমোহিত হয়ে কবি লিখেছেন অনবদ্য কবিতা:

ছিপখান তিন-দাঁড়
তিনজন মাল্লা,
চৌপর দিন-ভর
দেয় দূর-পাল্লা!

গ্রামবাংলার মা-বোনেরা পুরনো শাড়ির পাড় থেকে রঙিন সুতা তুলে নকশি কাঁথা সেলাই করে শীত ঋতু সামনে রেখে। সুনিপুণ হাতে সুঁইয়ের ফোঁড়ে লতাপাতা, বিচিত্র ফুলের নকশা ফুটিয়ে তুলে নকশি কাঁথায়। অনেক সময় এই নকশি কাঁথা উপহার দেওয়া হয় নতুন জামাইকে।

মাছে ভাতে বাঙালি এই প্রবাদ বাক্যটির পেছনেও রয়েছে বর্ষার অবদান। বর্ষার জলরাশিতে নদী-নালায়, খাল-বিল, পুকুর-ডোবায় মাছেরা পায় নতুন জীবন। হেমন্তে যে নবান্ন উৎসব বাংলার ঘরে উদযাপন করা হয় তার পেছনেও রয়েছে বর্ষার উর্বরা শক্তি। বর্ষার

পলিতে উর্বর হয়ে ওঠে জমি। পলিমাটির উর্বরতায় ফসলে ভরে ওঠে কৃষকের গোলা। গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ এ যেন বর্ষার অবারিত দান।

বর্ষার সজল বর্ষণ বাংলার মাটিকে করে সিক্ত। বাড়িয়ে দেয় উর্বরা শক্তি। সবুজে শ্যামলে মোহনীয় করে তুলে রসসিক্ত। বাংলার কবিরা বর্ষাকে নিয়ে লিখেছেন অজস্র কবিতা, গান, গীতিআলেখ্য। বাংলা সাহিত্যে বর্ষা ঋতু ছন্দে-উপমায় আপন মহিমায় হয়েছে সমুজ্জ্বল।

এই বর্ষা ঋতুতেই আবার অতিবৃষ্টি ও নদী প্লাবিত হয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়। ক্ষতি হয় ফল ও ফসলের এবং কাঁচা ঘরবাড়ির। জনজীবনে ঘটে ছন্দপতন। তাই বর্ষা একদিকে আনন্দের আরেকদিকে বিষাদের। তবুও বর্ষা জীবনপ্রবাহে বয়ে আনে সমৃদ্ধ।

ঐশ্বর্যে, সৌন্দযে, ফুলে, ফলে, ধানে, গানে ভরপুর করে তোলে বাংলার জনজীবন। তাই বর্ষা বাঙালির কাছে অতি প্রিয় অতি আদরণীয়। সবার কাছে অতুলনীয় ঋতু বর্ষা। ■

বৃষ্টি পড়ে

প্রিয়াস আলম

টুপটাপ বৃষ্টি পড়ে
ঘরের টিনের চালে
দলবেঁধে লাফিয়ে পড়ি
বাড়ির পুকুর জলে।
ভেলা নিয়ে ভেসে ভেসে
সকল বন্ধু মিলে
মনের সুখে শাপলা তুলি
পাশের বিলের জলে।

৬ষ্ঠ শ্রেণি, জালকুড়ি হাই স্কুল, নারায়ণগঞ্জ

আঙিনায় জাতীয় ফুল

আবদুল খালেক খান

শাপলা ফুল আমাদের দেশে কে না চেনে। এটি আমাদের জাতীয় ফুল। আবার আমাদের দেশে শাপলা সবজি হিসেবেও খাওয়া হয়। আমাদের বাচ্চারা ছোটোবেলা থেকেই শাপলা সম্পর্কে শুনে থাকে। কিন্তু শহরে থাকা বাচ্চারা অনেকে আছে যারা বাস্তবে শাপলা ফুল দেখেনি। কারণ শাপলা সাধারণত গ্রামের বিলে-ঝিলে-পুকুরে দেখা যায়। তবে তোমরা যারা শাপলা ফুল দেখোনি তাদের জন্য সুখবর হলো আজকাল বাড়ির ছাদে, ঘরের বারান্দায়, আঙিনায় বা উঠানেও শাপলা চাষ করা হচ্ছে। ছোট্ট বন্ধুরা চাইলে তোমরা তোমাদের বাসার ছাদে অথবা বাড়ির সামনে ছোট্টো জায়গায়ও শাপলার চাষ করতে পার।

শাপলা পানিতে জন্মে তাই এটি জলজ ফুল। খালে বিলে, হাওর-বাঁওড়ে, ঝিলে, পুকুরে বা পরিত্যক্ত জলাশয়ে এ ফুল জন্মে। এ ফুল চাষ করতে হয় না। এমনকি কোনো যত্ন ছাড়াই ফুটে থাকে অসংখ্য ফুল।

তোমরা শুনে অবাক হবে যে, বর্তমানে সারা পৃথিবীতে প্রায় ৮০ প্রজাতির শাপলা রয়েছে। এবং এর বিভিন্ন ধরনের নামও রয়েছে। যেমন শালুক, শাপলা, শুঁধি ইত্যাদি। শাপলা ফুলতো অনেক রঙের হয়। তবে কোন রঙের ফুলটা আমাদের জাতীয় ফুল? তা হয়ত অনেকে জানো না। হ্যাঁ বন্ধুরা সাদা রঙের ফুলটা হচ্ছে আমাদের জাতীয় ফুল। শ্রীলংকার জাতীয় ফুলও কিন্তু শাপলা, তবে ওদেরটা নীল রঙের। জানা যায় আজ থেকে প্রায় ১৬ কোটি বছর আগেও পৃথিবীতে শাপলার অস্তিত্ব ছিল। প্রাচীন মিশরে সাদা ও নীল রঙের শাপলার অস্তিত্বের প্রমাণ আছে। আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং এশিয়ার বহু দেশে শাপলা জন্মে। এমনকি আমেরিকা ও ইংল্যান্ডেও শাপলা আছে। আমাদের দেশে সাদা শাপলাই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। এরপরে আছে লাল, গাড় নীল, হালকা নীল এমনকি কোথাও আবার হলুদ রঙেরও দেখা যায়।

শাপলা এমন একটি জলজ বিরুৎ যা কোথাও জন্মালে সেখান থেকে তার মূল সম্পূর্ণ রুপে না উঠালে গাছ জন্মাতেই থাকে। শাপলা ফুল দেখতে অনেকটা পদ্মফুলের মতো। তবে পাপড়িগুলো পদ্মফুলের চেয়ে চিকন ও শক্ত। বসন্তের শেষ থেকে শরতের প্রথম পর্যন্ত ফুল ফুটলেও বর্ষাকালেই বেশি ফোটে। গাছের সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি হয় বর্ষায়। কখনো কখনো দেখা গেছে বন্যার সময় একরাতে ১ হাত বা দুই হাত পানি বেড়েছে। আর শাপলাটি পানির সাথে পাল্লা দিয়ে দুই হাতই বড়ো হয়েছে। মোট কথা তার ফুলটি পানির উপরেই থাকতে হবে। সাদা শাপলা ফোটে রাতে, দিনে বুজে যায়। এ কারণে সাদা শাপলাকে কুমুদ বলে। আর লাল ও নীল রঙের শাপলা ফোটে দিনে। পানি কমার সাথে সাথে শাপলা নিশ্চিহ্ন হতে থাকে। শীতকালে খাল-বিলের পানি শুকিয়ে গেলে শাপলা গাছ মরে যায়। তবে মাটির নীচে শিকড় ও বিচিগুলো সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বর্ষার আগমনে আবার শিকড় থেকে চারা গজায়।

এ তো গেলো বিল-ঝিলের কথা, এবার বাসা বাড়িতে শাপলার চাষ সম্পর্কে কিছু জানা যাক। প্রথমত- শাপলা চাষের জন্য রোদযুক্ত একটি জায়গায় বড়ো গামলা বা ড্রাম বা টব নিতে হবে। টবে উপযুক্ত কাদা মাটি দিয়ে তার সাথে গোবর খৈল এবং আরো অন্যান্য জৈব সার দিয়ে পাত্রটি পানি দিয়ে ভরে দিতে হবে।

শাপলার বীজ লাগানোর ক্ষেত্রে শাপলার গোড়ার দিকের মেথি সংগ্রহ করে টবের মাটিতে খুব যত্ন সহকারে পুতে দিতে হবে। শাপলার পাতা ও ফুলে ভরে না ওঠা পর্যন্ত টবের পানিতে পানা দিতে হবে যাতে পানি বেশি রোদে গরম না হয়ে যায়। পানি যাতে একেবারে না শুকায় সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। বাড়তি লতাপাতা হলে সেগুলো ছাটাই করলে ভালো হয়। প্রথম দিকে কিছু পাতা মরে যেতে পারে। তবে কয়েক মাসের মধ্যেই নতুন পাতা আসবে। চারা গজানোর ১ মাসের মধ্যে পানি বদলের প্রয়োজন নেই। পানি বদলের সময় পাত্রের গায়ে জন্মানো পিচ্ছিল শ্যাওলা পরিষ্কার করে নিলে ভালো হয়। বৃষ্টির পানি জমিয়ে সেই পানি শাপলার টবে দিলে গাছ ভালো থাকে। পাতা মরে গেলে সেগুলো পরিষ্কার করতে হবে। শাপলার গামলায় কিছু পানা ও গাপ্পি মাছ ছেড়ে দিতে হবে। এতে পানি পরিষ্কার থাকবে আর মশা ডিম পাড়লে গাপ্পি সেই ডিম ও লার্ভা খেয়ে পরিবেশ মশামুক্ত রাখবে। তবে নিয়মিত পরিমিত পরিমাণে মাছের খাবার দিতে হবে। ■

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে স্মারক বৃক্ষ

বাদল রহমান

জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ। লাগানো হবে এক কোটি গাছ যা পরিচিতি পাবে স্মারক বৃক্ষ হিসেবে। সফল হলে সবুজের ছায়ায়-মায়ায়, ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হবে বাংলাদেশ। এমনই সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ছিলেন বৃক্ষপ্রেমী। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটাকে নতুন করে ফুলে-ফসলে গড়তে চেয়েছিলেন জাতির পিতা কিন্তু পারেননি। আজ তাঁরই কন্যা আমাদের প্রধানমন্ত্রী দেশব্যাপী এক কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করে সবুজ শ্যামল সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। ১৬ই জুলাই সরকারি বাসভবন গণভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী এক কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মানুষের পুষ্টির চাহিদা পূরণ, আর্থিক স্বচ্ছলতা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় তিন ধরনের গাছ লাগানোর নির্দেশনা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশটা যেমন রক্ষা করা প্রয়োজন তেমনি দেশের মানুষের খাদ্য, পুষ্টি ও আর্থিক স্বচ্ছলতার বিষয়টিও চিন্তা করা দরকার। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, ফলজ গাছ মানুষের খাদ্যের ঘাটতি পূরণ করবে এবং পুষ্টি দেবে। ভেষজ গাছ থেকে ওষুধ তৈরি করা যাবে, যা মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং শরীর ভালো রাখবে। বনজ গাছ কাঠ দেবে, যা মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা বয়ে আনবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফলজ গাছ হিসেবে লাগিয়েছেন চালতা গাছ। এর পাতাগুলো দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি এর ফুলগুলোও সুন্দর। এছাড়া এর অনেক পুষ্টিগুণ রয়েছে। এটি মানুষের খাদ্য ঘাটতি পূরণেও সহায়তা করে।

ভেষজ গাছ হিসেবে লাগিয়েছেন তেঁতুল গাছ। যা মানব শরীরের জন্য খুবই উপকারী। খেলে মানুষের শরীর যেমন ঠান্ডা থাকে তেমনি এটি উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। দেশে এই গাছের চাহিদা থাকলেও ধীরে ধীরে এ জাতটি বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তাই প্রধানমন্ত্রী তেঁতুল গাছ লাগানোর ওপর জোর দিয়েছেন।

আর বনজ গাছ হিসেবে লাগিয়েছেন ছাতিয়ান গাছ। গাছটি খুবই বড়ো এবং কাণ্ড খুব মোটা হয়। যা কাঠ হিসেবে কাজে লাগানো যায়। তাই এই গাছটি লাগানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

দেশে সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টির লক্ষ্যে বনায়নের এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে অন্ততপক্ষে একটি করে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০২০ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সারা দেশে এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন, ১৬ই জুলাই ২০২০–পিআইডি

এরই ধারাবাহিকতায় পরিবেশ বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয় দেশের ৪৯২টি উপজেলার প্রতিটিতে ২০,৩২৫টি করে বিভিন্ন প্রজাতির বনজ, ঔষধি ও ফলজ বৃক্ষের চারা বন বিভাগের মাধ্যমে বিতরণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। মুজিববর্ষে রোপণের জন্য উত্তোলিত এক কোটি চারার মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ ফলজ এবং অবশিষ্ট ৫০ ভাগ বনজ, ঔষধি ও শোভা বর্ধনকারী প্রজাতির চারা রয়েছে। কোনো প্রকার বিদেশি প্রজাতির চারা এ কাজের জন্য উত্তোলন করা হয়নি।

'মুজিববর্ষের আহ্বান, লাগাই গাছ বাড়াই বন' প্রতিপাদ্য ধারণ করে সারা দেশে এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচি বিষয়ে অনলাইন সংবাদ সম্মেলনও করা হয়। এছাড়া সংসদীয় ৩০০ আসনের প্রতিটিতে পাঁচ হাজার করে মোট ১৫ লাখ বনজ, ফলজ ও ঔষধি গাছের চারা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হবে।

বন বিভাগের নিজস্ব ব্যবস্থাপনাতেও বনায়ন কার্যক্রমের আওতায় চলতি অর্থবছরে সাত কোটি বৃক্ষরোপণ করা হবে। পরবর্তীতে রোপণ করা এসব গাছের চারা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে। চলতি বছরের ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ■

নিবন্ধ

কদম ফুল প্রকৃতির অলঙ্কার

অ আ আবীর আকাশ

বর্ষা যেমন প্রকৃতিতে সূচি শুদ্ধতা নিয়ে আসে তেমনি বর্ষার অলংকার হিসেবে কদম ফুল তার আপন মহিমায় নিজেকে সৌন্দর্যের সবটুকু দিয়ে মেলে ধরে। কদম্ব বা কদম ফুল যে নামেই ডাকা হোক না কেন কদম ফুলের মতো অন্যান্য ফুলের এত নামডাক নেই বর্ষা ঋতুতে। বর্ষা ঋতুর প্রথম প্রহরেই কবি-সাহিত্যিকদের মাঝে কদম ফুল নিয়ে বেশ মাতামাতি হয়। লেখালেখি হয় কবিতা, ছড়া-গল্প।

বর্ষার আগমনি বার্তা নিয়ে আসে কদম ফুল। কদম যেন বর্ষার দূত! আষাঢ়ের সঙ্গে কদমের সম্পর্ক নিবিড়। সাধারণত আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টিতেই কদম ফোটে। প্রাচীন সাহিত্যের একটি বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে কদম ফুল। গোলাকার সাদা-হলুদ রঙের ফুলটি দেখতে অনেকটা ছোটো বলের মতো। গাছ ভরে এই ফুল ফোটে থাকে। সেই মুহূর্তটি এক অপূর্ব সৌন্দর্যের। কদম ফুল নীপ নামেও পরিচিত। এ ছাড়া বৃত্তপুষ্প, মেঘাগমপ্রিয়, কর্ণপূরক, ভৃঙ্গবল্লভ, মঞ্জুকেশিনী, পুলকি, সর্ষপ, ললনাপ্রিয়, সুরভি, সিন্ধুপুষ্পও কদমের নাম। এর আদি নিবাস ভারতের উষ্ণ অঞ্চল, চীন ও মালয়ে। বাংলাদেশ ছাড়াও চীন, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পাপুয়া নিউগিনি এবং অস্ট্রেলিয়ায় কদম গাছ রয়েছে।

কদমের সংস্কৃত নাম কদম্ব। কদম্ব মানে হলো দয়া, বিরহীকে দুঃখী করে! প্রাচীন সাহিত্যের একটি বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে কদম ফুল। মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্য জুড়ে রয়েছে কদমের সুরভি মাখা রাধা-কৃষ্ণের বিরহগাথা! ভগবত গীতা থেকে শুরু করে লোকগাথা, পল্লিগীতি ও রবীন্দ্র-কাব্যে পর্যন্ত কদম ফুলের উল্লেখ রয়েছে। ভানু সিংহের পদাবলি, বৈষ্ণব পদাবলি ও শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে নানাভাবে নানা আঙ্গিকে এসেছে কদম গাছের কথা। বহুল উপমায় বিভূষিত কদমের গুণগাথা।

কদম গাছ নিয়ে গ্রামবাংলার নানা ছড়া-কবিতাও রয়েছে। 'চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে কদম তলায় কে/ হাতি নাচছে ঘোড়া নাচছে সোনামণির বে'- এমন বহু ছড়ায় এখনও কদমের সুষমা প্রকাশ পায় মানুষের মুখে মুখে। কদম গাছ বৌদ্ধধর্মের একটি পবিত্র গাছ।

ভারতের পূর্বাংশে ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে জড়িত কদম গাছ। কদম গাছ দীর্ঘাকৃতি এবং বহুশাখাবিশিষ্ট। রূপসি তরুর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কদম। কদমের কাণ্ড সরল, উন্নত, ধূসর থেকে প্রায় কালো এবং বহু ফাটলে রুক্ষ, কর্কশ। শাখা আজর এবং ভূমির সমান্তরালে প্রসারিত। পাতা হয় বড়ো বড়ো, ডিম্বাকৃতি, উজ্জ্বল-সবুজ, তেল-চকচকে। এর বোঁটা খুবই ছোটো। নিবিড় পত্রবিন্যাসের জন্য কদম ছায়াঘন। এই গাছের উচ্চতা ৪০-৫০ ফুট পর্যন্ত হয়। শীতে কদমের পাতা ঝরে যায় এবং বসন্তে কচি পাতা গজায়। কদমের কচি পাতার রং হালকা সবুজ। কদমের একটি পূর্ণ মঞ্জুরিকে সাধারণত একটি ফুল বলেই মনে হয়।

কদম ফুল দেখতে বলের মতো গোল, মাংসল পুষ্পাধারে অজস্র সরু সরু ফুলের বিকীর্ণ বিন্যাস। এই ফুলের রং সাদা-হলুদে। তবে পাপড়ি ঝরে গেলে শুধু হলুদ রঙের গোলাকার বলের মতো দেখা যায়। গাছের ফল মাংসল এবং টক, যা বাদুড় ও কাঠবিড়ালীর প্রিয় খাদ্য।

কদম গাছের কাঠ নরম বলে আসবাবপত্র তৈরি করা যায় না। তবে দিয়াশলাই ও বাক্স তৈরি হয়ে থাকে। গাছের ছাল জ্বরের ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাতার রস ছোটোদের কৃমির জন্য খাওয়ানো হয়। ছাল ও পাতা ব্যথানাশক। মুখের ঘায়েও পাতার রস কার্যকর।

ধীরে ধীরে প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে কদম ফুল। বাংলার বিভিন্ন জেলায় এক সময় প্রচুর কদম গাছ চোখে পড়ত। যান্ত্রিক সভ্যতা ও নগরায়ণের যুগে মানুষের সামান্য প্রয়োজনে কদম গাছকে তুচ্ছ মনে করে কেটে ফেলছে। কদম ছাড়া বর্ষা একরকম বেমানান। প্রকৃতির ঐতিহ্য রক্ষায় এসো আমরা অন্য গাছের পাশাপাশি কদম গাছও লাগাই। ■

অনিয়া হক, পঞ্চম শ্রেণি, ইএসএস স্কুল, ধানমন্ডি, ঢাকা

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে

জাতির পিতা

নুসরাত জাহান

জাতির পিতা তুমি আছো
আমাদের হৃদয়ের গভীরে
তোমার আদর্শেই আজ
আমরা এগিয়ে যাচ্ছি সুদূর পানে।
তুমি আছো ঘুমিয়ে তবু জাগ্রত চিরদিন
তাই তো তোমার মাঝেই আমরা বিলীন।
তুমি মহান, তোমার স্বপ্নকে ধারণ করেই
আজ আমাদের পথচলা।
তোমার ত্যাগ আমাদের করেছে মহান।
তাই তো তুমি ‘বাংলাদেশের’ আরেক নাম।

বঙ্গবন্ধু

আহনাফ সিদ্দিকী

নীল আকাশের তারার মতো
ভালোবাসি প্রিয় বঙ্গবন্ধুকে
তাঁর কথা লেখা আছে
বাংলাদেশের মানুষের বুকে।

যুগ যুগ ধরে তাঁকে নিয়ে
লেখা হবে শত শত গল্প-কবিতা
তিনিই সংগ্রাম করে এনে দিলেন
বাঙালির স্বপ্নের স্বাধীনতা।

৬ষ্ঠ শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

এখন বৃষ্টি হলেই

মো. হাসান মাসুদ

এখন বৃষ্টি হলেই
মায়ের কথা মনে পড়ে...
মা বলতেন বৃষ্টি আমাদের জন্য আশীর্বাদ
একমাত্র বৃষ্টিই পৃথিবীর তাপ শুষে নেয়।
তামাম দুনিয়ার মানুষ যদি
পিঁপড়াদের ঐক্যতা অবলম্বন করে
আর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে
তবুও ঋণ পরিশোধ হবে না।
এখন বৃষ্টি হলেই
মায়ের কথা মনে পড়ে...
আমাদের মাটির ঘরে
পুরনো তালপাতার ছাউনির ফুটো দিয়ে
যখন জল ভিজিয়ে দিত শরীর -
তখন মায়ের বুকে পেতাম বাঁচার উষ্ণতা।
এখন বৃষ্টি হলেই
মায়ের কথা মনে পড়ে খুব -
তুমি কেমন আছো - মা?

বৃষ্টি আপুর কান্না

আরিফুল ইসলাম সাকিব

কাঁদছ কেন
বৃষ্টি আপু
জানতে কি তা পারি?
ঝিনুকমালা
তোমার সাথে
দিয়েছে কি আড়ি?
নীল-আকাশে
মেঘ জমেছে
মেঘের শরীর কালো,
সেই কারণে
আঁধার হলো
নিভল দিনের আলো।
দিন-রজনী
কেঁদে-কেঁদে
অঝোর ধারায় নামো!
আর কেঁদো না
বৃষ্টি আপু
একটু এবার থামো।

বর্ষা

তাহমিদ হোসেন

সাতসকালে মেঘ করেছে
সূয্যি নাহি ওঠে
নামবে বুঝি অঝোর ধারা
পাখ-পাখালি ছুটে।

বর্ষাকালে দারুণ মজা
জানালা খুলে দেখ
হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি ছুঁতে
ভালো লাগে কত!

এমন দিনে মনে পড়ে
কবি গুরুর গান
তাই তো তোমায় শ্রদ্ধা জানায়
আমার মনোপ্রাণ।

৮ম শ্রেণি, যাত্রাবাড়ি মডেল হাই স্কুল, ঢাকা।

আম কুড়ানি সুখ

মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম ফকির

ঝড়ের সাথে বৃষ্টি এল
গোমরা হলো মুখ,
সেই যে কবে হারিয়ে গেছে
আম কুড়ানি সুখ।
গোসল ছাড়া বসে থাকতাম
কখন আসবে ঝড়,
এই গাঁও থেকে ঐ গাঁও যেতাম
পেতাম নাকো ডর।
কিশোর কিশোরী মিলে
বস্তা, বালতি নিয়ে,
যে গাছে আম দেখেছি বেশি
বসছি নিচে গিয়ে।
ঝড়ের সময় আম কুড়াতে
লাগত জড়াজড়ি,
কার আগে কে ধরবে যে আম
কাদায় গড়াগড়ি।
কারো ছিল বিয়ারিং-এর
তিন কাঠের এক গাড়ি,
ঝড়ের শেষে বস্তা ভরে
আম নিয়েছি বাড়ি।

জন্ম নিবন্ধন দিবস

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

কোনো কোনো কাজকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দিবস পালন করা সারা বিশ্বের একটি প্রচলিত পদ্ধতি। বাংলাদেশেও নানা দিবস পালনের মতো ২০০৭ সাল থেকে প্রতি বছর ৩রা জুলাইকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে জন্ম নিবন্ধন দিবস হিসেবে পালন করে আসছে।

দিবসটি উপলক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও ইউনিসেফ বাংলাদেশের উদ্যোগে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র ও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে। এছাড়া বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ব্রিটিশ সরকার ১৮৭৩ সালের ২রা জুলাই অবিভক্ত বাংলায় জন্ম নিবন্ধন আইন জারি করা হয়। বিশ্বব্যাপী জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম গুরুত্ব লাভ করায় ইউনিসেফের সহায়তায় বাংলাদেশেও নতুন করে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম আরম্ভ হয়।

এই ধারাবাহিকতায় ২০০৪ সালে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৬ সালে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা জারি হয়। জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, শিশু অধিকার সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে আইনটি ৩ রা জুলাই ২০০৬ থেকে কার্যকর করা হয়। জন্ম নিবন্ধন আইনে বলা হয়েছে বয়স, জাতি, গোষ্ঠী বা জাতীয়তা নির্বিশেষে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেকটা মানুষের জন্য জন্ম নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। ২০১০ সাল থেকে অনলাইনে জন্মনিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয়।

জন্মের পর সরকারি খাতায় প্রথম নাম লেখানোই জন্ম নিবন্ধন। একটি শিশুর জন্ম নিজ দেশকে, বিশ্বকে আইনগতভাবে জানান দেওয়ার একমাত্র পথ জন্মের পর জন্ম নিবন্ধন করা। এটি প্রতিটি শিশু তথা বয়স্কদেরও একটি অধিকার। এটি একটি নাগরিক অধিকার। পৃথিবীতে একটি শিশু জন্মানোর পর রাষ্ট্র থেকে প্রথম যে স্বীকৃতি পায় সেটি হলো জন্ম নিবন্ধন। দেশের অন্যান্য নাগরিকের সাথে সে সমান অধিকারে এক কাতারে সামিল হয় এই জন্ম নিবন্ধনের মাধ্যমে। প্রথম জন্ম নিবন্ধনের অধিকার জাতিসংঘের শিশু সনদে (Convention on the Rights of the Child. CRC) স্পষ্ট উল্লেখ আছে। জন্ম নিবন্ধনের মধ্যদিয়ে একটি শিশু একটি নাম লাভ করে। যা সারাজীবন তাকে পরিচিতি দেয়।

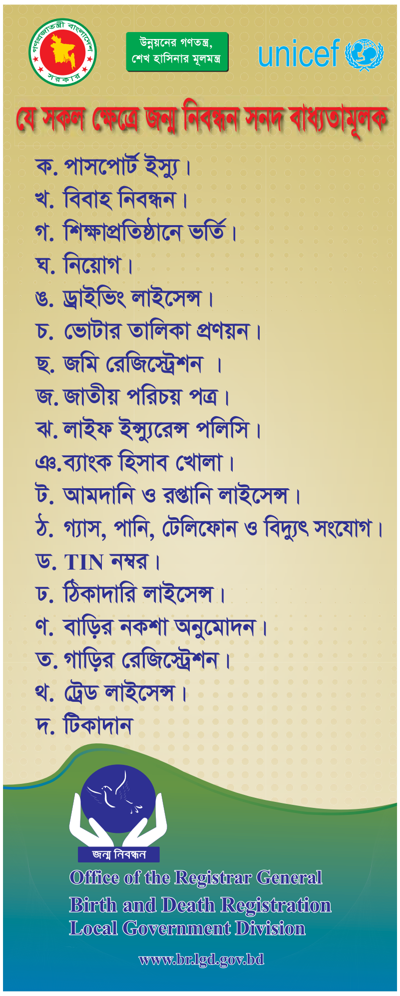

২০০৯ সাল থেকে ১৬টি মৌলিক সেবা পেতে জন্মসনদ প্রয়োজন। জন্ম নিবন্ধন থাকলে বাল্যবিবাহের সুযোগ কমে যাবে। শিশু শ্রম বন্ধ হবে। জন্ম নিবন্ধনের একটি তাৎপর্যও রয়েছে। জন্ম নিবন্ধনের মাধ্যমে রাষ্ট্র স্বীকার করছে যে, হ্যাঁ তুমি শিশু রূপে এ রাষ্ট্রে একজন ভবিষ্যৎ নাগরিক। তোমাকে এ রাষ্ট্রের স্বীকৃত নাগরিকের মর্যাদা ও সকল সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। তোমাকে স্বাগতম।

সুতরাং ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করার জন্য জন্ম নিবন্ধন অবশ্যই প্রয়োজন। জন্ম নিবন্ধন না করালে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। মর্যাদা পাওয়া যায় না, সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় না। আইনগত সমস্যার সমাধান করা যায় না ইত্যাদি। এসব কারণে জন্ম নিবন্ধন করতে হবে। ■

ক্যাপটেন শুভমের লকডাউন

পরীক্ষিৎ চৌধুরী

‘মা, করোনা’র মালিক কে?’ ভ্রূ কুঁচকে বিজ্ঞের মতো প্রশ্ন করল শুভম।

ডাইনিং রুমের বেসিনে সাবান দিয়ে হাত ধুতে ধুতে এমন কৌতূহলী প্রশ্নগুলোই করছে সে।

সাত বছর বয়সি পুত্রের এমন অদ্ভুত প্রশ্নের জবাব কী দিবেন বুঝে উঠতে পারছেন না শুভমের মা।

-‘মা, করোনার মালিক কেন ভাইরাসটাকে ছড়িয়ে দিলো পৃথিবীতে? পৃথিবীর মানুষগুলো কী এমন পাপ করেছে যে করোনা সব মানুষ মেরে ফেলতে চাইছে?’

শুভমের এমন প্রশ্নের কোনো উত্তর মায়ের জানা নেই। তিনি বারান্দার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে বাইরের রাস্তায় চোখ রাখেন। জনমানবশূন্য রাস্তা। দশ-বিশ মিনিট পরপর কাউকে হয়ত দেখা যায়। রিকশাও তেমন চোখে পড়ে না।

শূন্য রাস্তার মতো মায়ের চোখেও শূন্যতা।

শুভম বোঝে না, কেন তার এসব প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারে না।

সে মনে মনে ভাবে করোনার মালিকের সন্ধান তার চাই-ই চাই। এই করোনার জন্য সে চার মাস ধরে ঘরের মধ্যে আটকে আছে। স্কুলে যেতে পারছে না। কোথাও বেড়াতে যেতে পারছে না। রেস্টুরেন্টে গিয়ে নিজের পছন্দের খাবারও খেতে পারছে না।

এই মন খারাপের ভিড়ে নতুন কারণ যোগ হয়েছে আরো একটি।

তার কাছের বন্ধু দিহান সেদিন কিছু কেনাকাটা করতে মার্কেটে গিয়েছিল। কিন্তু শুভম মার্কেটে ও যেতে পারছে না। তার মা তাকে নিয়ে যাচ্ছেন না। বাবা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, ‘করোনা যতদিন থাকবে, ততদিন মার্কেটে যাওয়া যাবে না। ভিড় হয় এমন জায়গায় এ সময় যাওয়া উচিত না।‘

করোনা ভাইরাসের কথা শুভম এখন মোটামুটি ভালোই জানে। পৃথিবী জুড়ে করোনা নামের এই ভাইরাসে নাকি লাখ লাখ মানুষ মারা যাচ্ছে। এই করোনার ওপর তার বেশ রাগ হয়েছে। বাবা-মার ওপরও তার রাগ অনেক। দিহান যদি পারে, সে কেন মার্কেটে যেতে পারবে না?

শুভমরা ঢাকায় থাকে। সে ক্লাস টু-তে পড়ে। তার ছোটো বোনের নাম শাওলি। শাওলি এখনো স্কুলে যাওয়া শুরু করেনি। তবে অ, আ, ক, খ পড়া হয়ে গেছে। শুভমই তাকে এসব শিখিয়েছে।

বয়সে ছোটোদের তো বটেই, বেশি বয়সের বাচ্চাগুলোকেও শুভম সব সময় সাহায্য করতে চায়। সবাইকে ছোটোখাটো বুদ্ধিগুলো ভাগ করে দেওয়া তার নিত্যদিনের অভ্যাস। অবশ্য এই গুণটা তার মধ্যে আরো বেশি দেখা দিয়েছে স্কুলে ক্যাপটেন হওয়ার পর থেকে। শুভম তার ক্লাসে ক্যাপটেন। ক্যাপটেন হিসেবে তাকে সবার দিকে খেয়াল রাখতে হয়। স্কুলের বাইরেও তার মধ্যে এখন ক্যাপটেন ক্যাপটেন ভাব এসে গেছে।

শুভমের স্কুল বন্ধ। স্কুল বন্ধের কারণ প্রথম দিকে ঠিক পুরোপুরি বুঝে উঠতে না পারলেও এখন এটুকু সে জেনে গেছে, সারা দুনিয়ায় একটি রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। যার জন্ম হয় করোনা নামের একটি ভাইরাস থেকে। এই রোগ খুবই ভয়াবহ এবং একজন রোগীর হাঁচি-কাশি থেকে তা যে-কারো শরীরে ঢুকে যেতে পারে। তাই সব স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

তবে এই রোগটি যাতে না হয় তার জন্য কী কী করা উচিত সেগুলো বাবা-মা এবং টেলিভিশনের বরাতে এরই মধ্যে জেনে গেছে। সে শাওলিকেও মাঝে মাঝে বলে, ‘বার বার সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। আশপাশে পড়ে থাকা জিনিসপত্র ধরবে না। হাত লেহন করা যাবে না, নাকে আঙুল দেওয়া যাবে না, চোখ ঘষাঘষি করা যাবে না।’ এগুলো শাওলিকে বার বার বলে। ছোট্টো বোনটি এত কিছু বোঝে না। গোল গোল চোখ করে ভাইয়ার কথা শোনে। শাওলিকে বার বার বলা এবং সে মানছে কিনা সেটা খেয়াল করাও যেন শুভমের খেলার অংশ হয়ে গিয়েছে আজকাল।

তাদের বাবা-মা সবার খাবারের থালা-বাটি, ব্যবহারের তোয়ালে এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ছোটোবেলা থেকেই আলাদা রাখছেন যাতে অন্য কেউ ব্যবহার না করে। বর্তমান সময়ে খুবই সতর্কতার সাথে তারা এটা নিশ্চিত করছেন।

ভিড় হতে পারে এমন এলাকা বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শুভম ও শাওলির যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন বাবা-মা। বাসার পাশে মহল্লার ভিতরে একটা ছোটো পার্ক আছে। শুভম সেখানে বন্ধুদের সাথে খেলতো। আপাতত তার পার্কেও যাওয়া বন্ধ।

ক্যাপটেন শুভম তার বন্ধুদেরকে বলে দিয়েছে, এখন থেকে পার্কে আসা যাবে না। ঘরেই থাকতে হবে।

কিছুদিন আগে শুভমরা যখন বাইরে বের হতো তখন বাবা-মাসহ সবাই নিজেদের সুরক্ষার নিয়মগুলো মেনে চলত। সে ও তার বোন চাইল্ড মাস্ক ব্যবহার করত। বাইরে থেকে ফিরে এসে কাপড় চেইঞ্জ করে সাথে সাথে হাত ও মুখ ভালো করে ধুয়ে নিতো।

দুই সপ্তাহ আগে শুভমের মামাতো বোন শুক্তিকার টিকা দেওয়ার সময় হয়েছিল। শুক্তিকার মা ফোন করেছিলেন শুভমের মাকে, করোনার এই দুঃসময়ে টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে কী কী করতে হবে তা জানতে চাইলেন। শুভমের মা জানেন, এক্ষেত্রে কী করতে হবে। তিনি জানালেন, মহামারি চলাকালে টেলিফোনের মাধ্যমে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে টিকাদানের সময়কাল ঠিক করে নেওয়া যায়। তবে শিশুর টিকার সময় চলে এলে যথাযথ সুরক্ষা নিয়ে বাচ্চাকে টিকাদান কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে টিকা দেওয়া উচিত। যদি টিকার সময় পরিবর্তন করা যায় তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েই তা করতে হবে, এটাও জানিয়ে রাখলেন তিনি।

দুই

শুভমরা রাজধানীতে থাকে। তারা স্বাস্থ্য সচেতনতার অনেক খুঁটিনাটি জানলেও মফস্বলে বা গ্রামে বাস করা সব বাবা-মা কি এত কিছু জানেন?

সব জায়গায় কি সচেতনতার প্রচারণা যথাযথভাবে হয়েছে? তাঁদের অনেকেই জানেন না, যিনি শিশুর দেখাশোনা করে, তার হাত সব সময় পরিষ্কার রাখতে হয়। শিশুর সামনে কখনো হাঁচি-কাশি দেওয়া অথবা ফুঁ দেওয়া উচিত না। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে শিশুকে চুমু খাওয়াও নিষেধ। বেশিরভাগ বাবা-মা কি জানেন, খাওয়ানোর সময় ফুঁ দিয়ে গরম খাবার ঠান্ডা করা উচিত না। তাদেরকে জানতে হবে, আগে থেকে খাওয়া কোনো কিছু শিশুর মুখে দেওয়া স্বাস্থ্যকর না। শিশুর পরিচর্যার সময় বাবা-মা অথবা শিশুর তত্ত্বাবধায়ককে মাস্ক পরতে হবে। বাবা-মা, অভিভাবক অথবা শিশুর তত্ত্বাবধায়কের যদি জ্বর, ঠান্ডা, শুকনো কাশি, গলাব্যথা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয় তবে সাথে সাথেই শিশুর পরিচর্যা ছেড়ে দিয়ে অন্য কারো হাতে সেই দায়িত্ব দিয়ে দিতে হবে এবং নিজেকে হোম কোয়ারেন্টাইনের আওতায় নিয়ে নিতে হবে।

তিন

চার মাস হলো দেশের স্কুলগুলো বন্ধ। প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, করোনা পরিস্থিতির উন্নতি না হলে আগামী সেপ্টেম্বরের আগে স্কুল খুলবে না। এ সময় শিশুদের পড়াশোনার ওপর যেন কোনোভাবেই নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখার জন্য অভিভাবকদের সচেতন থাকতে হবে।

সরকারও এক্ষেত্রে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকে সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে দূরশিক্ষণ অনুষ্ঠান চালু করা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যবই অনুযায়ী শিক্ষাদান শুরু করা হয়েছে। অনলাইন শিক্ষার কৌশল ও শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়কে গণমাধ্যমে সম্প্রচারের মতো দূরবর্তী শিক্ষণ পদ্ধতিসহ শিক্ষার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা এবং সকল শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় সেবাসমূহের সুযোগ নিশ্চিত করতে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করাই এর মূল লক্ষ্য।

স্কুল বন্ধ থাকাকালে দূরবর্তী শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য অভিভাবকদেরকেই মূল দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে স্কুলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ইউনিসেফ। শুভমের মতো দেশের সব শিক্ষার্থী এখন সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে নিয়মিত দূরশিক্ষণে ক্লাস করছে। বাবা-মা এই ক্লাস করার জন্য তাকে সাহায্য করছেন। তারা শাওলিকেও টেলিভিশনে প্রাক-প্রাথমিক ক্লাস করতে উৎসাহ দিচ্ছেন।

এই বিষয়ে স্কুলে, নিজেদের বাড়িতে এবং তাদের কমিউনিটিতে ভাইরাসটির বিস্তার রোধ ও নিয়ন্ত্রণে উৎসাহ যোগাতে শিশুদের দূত হিসেবে শিশুরাই এগিয়ে আসতে পারে বলে অভিমত দিয়েছে ইউনিসেফ। রোগটির প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অন্যদের সাথে কথা বলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এ কাজটি করতে পারে। যে কাজটি আমাদের ক্যাপটেন শুভম করে চলেছে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০১৪ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ইবোলা ভাইরাসজনিত রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় গিনি, লাইবেরিয়া এবং সিয়েরালিওনে নিরাপদ স্কুল নির্দেশিকাগুলো এভাবেই কার্যকর করা হয়েছিল যা ভাইরাসের স্কুলভিত্তিক সংক্রমণ রোধে সহায়তা করেছিল।

শিশুদেরকে এবং পরিবারকে রক্ষার জন্য হাত ধোয়া ও অন্যান্য পদক্ষেপগুলোর বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সঠিকভাবে জানাতে অভিভাবকদের পাশাপাশি শিশুদেরকেও সচেতন থাকতে হবে। এছাড়াও, অভিভাবকদের উচিত শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা প্রদান করা; বাড়িতে থাকাকালে যেন শিশুরা সকলের সাথে সদয় আচরণ করে সে পরামর্শ দেওয়া এবং ভাইরাসটি সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় গৎবাঁধা চিন্তা এড়াতে কুসংস্কার ও বৈষম্য রোধে তাদের উৎসাহিত করা বড়োদের দায়িত্ব। শিশুদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে এবং তাদের উদ্বেগগুলো প্রকাশ করতে উৎসাহ জোগানো উচিত। শিশুদের পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুম নিশ্চিত করে তাদেরকে পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ সুষম খাবার খাওয়াতে হবে।

চার

স্কুল বন্ধের দিনগুলো শুভম-শাওলির খুব আনন্দে কাটছে। প্রায় দুই মাস অফিস বন্ধ ছিল বলে তাদের বাবা-মা বাসায় যথেষ্ট সময় দিতে পেরেছেন। এখন সীমিত আকারে অফিস খুললেও বাব-মা অনেক সময় দিতে পারেন। স্কুল বন্ধ থাকলেও তাদের বাসায় বসে পড়ালেখা থেমে থাকেনি। বাবা-মা তাদের পাঠ্যবই পড়ানোর পাশাপাশি বিভিন্ন গল্পের বইও পড়তে দিচ্ছেন। শুভমের ছবি আঁকার শখ আছে, তার ছবি আঁকার চর্চাও চলছে পুরোদমে। শাওলির গান শেখাও নিয়মিত চলছে। লকডাউনের সময়গুলো যেন তারা সঠিকভাবে কাটাতে পারে সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখছেন বাবা-মা।

শুভমের দাদি থাকেন তাদের সাথে। তার সাথে গল্প করে, ঘরোয়া খেলা খেলে তাদের সময় কেটে যায়।

শুভমের মোবাইল ফোন আর আইপ্যাডে গেইম খেলার ঝোঁক আছে। এই দীর্ঘ বন্ধের সময় একটানা দীর্ঘক্ষণ যে-কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইসে চোখ রাখা শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই শুভমের বাবা-মা এ বিষয়ে খুব সাবধানি। তারা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাচ্চাদেরকে মোবাইলে গেইম খেলার সুযোগ করে দেন।

মন খারাপ দূর করার জন্য শুভম ছবি আঁকতে বসল। তার ছবির বিষয় হলো যুদ্ধ। সে আঁকছে একদল মানুষ একটা ভাইরাসের সাথে যুদ্ধ করছে। কিন্তু সে ভাইরাসের ছবি আঁকতে পারছে না। সে তো ভাইরাসকে দেখেইনি নাই। তবুও সে যুদ্ধ যুদ্ধ ভাবের ছবি আঁকার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

হঠাৎ তার মা এসে জানালো দিহানের সেই চাচার করোনা রোগ হয়েছে। শুভম চিন্তায় পড়ে গেল। সে শুনেছে, এই রোগের কারো কাছাকাছি গেলে তারও এ রোগ হতে পারে।

ছবি আঁকা বাদ দিয়ে সে ভাবতে লাগল, দিহানকে তো ডাক্তারের সাথে কথা বলতে হবে। সে জানে, এ সময় ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করতে হয়। দিহানের উচিত বিষয়টা জানিয়ে প্রতিবেশী ও আশপাশের মানুষদেরকে সচেতন করে দেওয়া। স্কুল খোলা থাকলে শিক্ষক-বন্ধুদেরকেও জানিয়ে রাখতে হতো এটাও সে এতদিনে জেনে গেছে।

ক্যাপটেন শুভম বসে থাকতে পারল না। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। দিহানকে একটা ফোন করতে হবে। ■

করোনার গল্প

সৃজনের সিদ্ধান্ত

বিশ্বজিৎ সেন

সারা দুনিয়ায় করোনা আতঙ্ক। বাংলাদেশের তাবৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বন্ধ ঘোষিত হয়েছে। সৃজনের স্কুল বন্ধ। প্রাইভেট টিউটরও আসে না। ফ্ল্যাটেই বন্দি। খেলাধুলাও বন্ধ। প্রথম প্রথম কটা দিন ভালোই লেগেছিল তার। মা-বাবা-ছোটো বোন, সবাই তারই মতো। খাঁচাবন্দি ময়নাটার মতোই ফ্ল্যাটে বন্দি ।

নবম শ্রেণির ছাত্র সৃজন। তিন তলার ফ্ল্যাটের বারান্দায় মা'র প্রিয় ময়নাটা সবার নাম ধরে ডাকাডাকি করে সারাদিন। লক ডাউনের আগে সৃজনের ময়নাটার প্রতি তেমন আকর্ষণ ছিল না। ফ্ল্যাট বন্দি হওয়ার পর থেকে একটু একটু করে এর প্রতি সৃজনের কৌতূহল বেড়ে চলেছে। তাদের ফ্ল্যাটের পাশেই বেশ কয়েকটা আম-জাম-কাঁঠালের গাছ। আগে যেসব গাছে পাখি দেখা যেতো না। ইদানীং সেসব গাছে প্রচুর পাখির উপস্থিতি লক্ষ করছে সৃজন। টিভিতে প্রায় প্রতিদিনই পরিবেশ ও পশুপাখির বিষয়ে ইতিবাচক সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে। সৃজন মাঝে মধ্যে সেসব সংবাদ মন দিয়ে দেখে। ইদানীং যেন হাতে-নাতে প্রমাণ পাচ্ছে সেসব সংবাদ ও প্রতিবেদনের। তাদের ফ্ল্যাটের পাশের গাছগুলোতে কোনো ধরনের লতা ছিল না। সৃজন দেখছে, বেশ কয়েকটা লতা; গাছের কাণ্ড বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে অতি দ্রুত। ফুল ফুটছে। মৌমাছি আর প্রজাপতি কতদিন পর যেন ফিরে এল। গাছগুলোর গোড়া ঘিরে কী সুন্দর সুন্দর ঘাস মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

সৃজন এখন মায়ের পোষা ময়নাটার বন্ধু। দুটি বন্দি জীবন যেন কোনো এক অমোঘ অভিপ্রায়ে একাত্মতা ঘোষণা করল কোনোরকম আধিক্যতা না দেখিয়ে

ঢাক-ঢোল না পিটিয়েই। সে ময়নাটাকে প্রশ্ন করে। তার দাবি, সে ময়নাটার জবাব শুনতে পায়!

‘ও ময়না, আগে তুমি কত কথা বলতে। এখন অনেকটা নীরব হয়ে গেলে কেন?’

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর ময়নাটা পাখঝাড়া দিয়ে বলতে থাকে বিষণ্ন স্বরে: ‘দেখছ না ঐ গাছগুলোতে কত রকমের পাখির আসা-যাওয়া? কী বিচিত্র স্বাদের মিষ্টি গান সারাক্ষণ গেয়ে চলছে ওরা!’

‘তাতে তো তোমারও মন ভালো হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু দেখছি তো এর উলটো চিত্র! কেন গো ময়না?’

‘তোমাদের মানুষদের জন্য এখন সারা দুনিয়া জুড়ে লকডাউন চলছে। সাথে চলছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বাইরে যাওয়া আর নিজ নিজ ঘরেই হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশনা। তাই না সৃজন?’

‘হ্যাঁ ময়না, এক্কেবারেই তাই।’

‘কিন্তু দেখো, আমাদের জন্য ওসব কিছুই নাই। গাছপালা, লতাপাতা, ঘাসগুল্ম দেখো কেমন আনন্দের আতিশয্যে বেড়ে উঠছে। ওখানে এত পাখি দেখেছ কখনো?’

‘নাতো।’

‘বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে?’

‘হ্যাঁ, পড়েছি তো।’

‘ওরা বুঝে গেছে যে, মানুষ কোনা কারণে ভীষণ ভয় পেয়ে ঘরে বন্দি হয়েছে। গাড়ির হর্ন আর কালো ধোঁয়ার উৎপাত কমে গেছে অকল্পনীয় মাত্রায় কমপর্যায়ে। তাই না সৃজন?’

‘তাই তো দেখছি, ময়না।’

‘তাই দেখো চারদিকে সবুজের কেমন মনকাড়া সমারোহ। গাছে গাছে, লতায় গুল্মে, ঘাসে জন্মের পর থেকে এত ফুল ফুটতে দেখেছ কখনো?’

‘না!’

‘ধরিত্রী চায়, সে আবার তার আগের রূপে ফিরে যেতে। তাই তো চারিদিকে নিসর্গে প্রাণের জোয়ার আসতে শুরু করেছে সৃজন। যেখানে নিসর্গ, নির্ভয়ে বেড়ে উঠার সুযোগ পায়; পাখি আর পশুরা তো সেখানে প্রাণের আনন্দে মানুষের সৃষ্ট অন্যায় বিধি-নিষেধ যত অমান্য করতে শুরু করবেই। দেখছ না, টিভিতে দেখাচ্ছে কোনো কোনো দেশে বন্যপ্রাণিরা অরণ্য ছেড়ে লোকালয়ে ঢুকতে শুরু করেছে।’

সৃজন ‘হা’ করে তাকিয়ে থাকে ময়নাটার দিকে।

প্রশ্ন করে ময়না ‘কী দেখছ অমন করে?’

না মানে ইয়ে, মুখ কালো কেন সে প্রশ্নের উত্তর তো দিলে না?’

‘ও! সে কথা? এতদিন ধরে দেখেছি ওই গাছগুলো কেমন মনমড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও কোনো লতা আর গুল্মের চিহ্নও ছিল না। ঘাসগুলোর অবস্থাও ছিল কী যে করুণ। খাঁচার ভেতর থেকে সেসব দৃশ্য দেখে আমিও কেমন মনমড়া হয়ে গিয়েছিলাম। এখন যখন দেখছি কালোধোঁয়া নেই, মানুষের হৈচৈ নেই, শুনছি না কান ঝালা-পালা করা গাড়ির মাত্রাতিরিক্ত শব্দের হর্ন, তখন যেন ওই পাখিগুলোর মতো আমারও প্রাণের সুরে গান গাইতে ইচ্ছা করছে গো! কিন্তু, আমি তো বন্দি।”

সৃজনের প্রাণে যেন কেউ একটা সজোরে চিমটি কেটে সরে গেল! ময়নাটার দিকে তাকাতেই যেন ভীষণ লজ্জা লাগছে তার! ‘পেয়েছো কী তোমার প্রশ্নের উত্তর সৃজনবাবু?’

সৃজন শব্দহীন শুধুমাত্র মাথা নেড়েই জানাল প্রশ্নের উত্তর সে পেয়েছে।

ময়না আবারও বলতে থাকে, ‘জানো সৃজন, এ দুনিয়ায় জলে-স্থলে যত জীবজন্তু, পশুপাখি ও গাছপালা, লতাগুল্ম আছে; সবাই মানুষের আগ্রাসী আচরণে ক্ষিপ্ত। তাই কালে কালে, যুগে যুগে এদেরই আর্তনাদে প্রকৃতি এগিয়ে এসে মানুষকে বুঝিয়ে দেয় যে, তার কাছে মানুষের সকলশক্তিই অগ্রহণযোগ্য। মেরুর

বরফ গলতে শুরু করেছে দ্রুত মাত্রায়। তুষারাবৃত পর্বতমালা হারাচ্ছে তাদের শুভ্রমুকুট। ওজনস্তরের বেহাল অবস্থা। সবকিছুর জন্যই দায়ী একমাত্র মানুষ!'

সৃজন আচমকা চমকে উঠল।

'করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯ নামে যাকে শনাক্ত করছ আসলে এটা মানুষের উপর প্রকৃতিপ্রদত্ত দণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। অতীতে এমন দণ্ডে অনেক সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার প্রমাণ মিলেছে। শোনা যায় একশ বছর পর পর এ ধরণের দণ্ড প্রকৃতি মানুষের উপর প্রয়োগ করে।'

'তাহলে কী করোনা ভাইরাসের কবল থেকে মানবজাতি মুক্তি পাবে না, ময়না?'

'অবশ্যই পাবে। প্রকৃতি তো মানবজাতিকে বিনাশ করতে চায় না। চায় শাসনে রাখতে। চায় আগ্রাসী উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে পিছিয়ে আনতে।'

সৃজন বারান্দার গ্রিলে দু'হাত রেখে অসহায় উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল নীল আকাশের দিকে। যেখানে ভেসে বেড়াচ্ছে কয়েকটা সাদা রঙের যাযাবর মেঘ।

গাছগুলো নানারকম পাখির কলকাকলিতে কেমন মুখর হয়ে উঠেছে। কতদিন পর গ্রামের বাড়ির মতোই নানারকমের প্রজাপতির এলোমেলো উড়াল আলপনা দেখছে সে।

হঠাৎ ময়নাটা প্রশ্ন করে বসে, 'আমাকে মুক্তি দেবে?' চমকে উঠে সৃজন ময়নাটার এই অপ্রত্যাশিত আবেদনে। মায়ের বড়ো আদরের পোষা ময়না। কী করবে ভাবতে থাকে সে। ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘোরের মধ্যেই খাঁচার কাছে গিয়ে এর দরজাটা খুলে দিলো!

অনেকটা আর্তনাদের মতোই মা এসে বলে উঠলেন, 'সৃজনের, আমার ময়নাটা কই?'

আকাশের দিকে তাকিয়ে কেমন নির্ভার স্বরে ছোট্ট একটা শব্দ উচ্চারণ করল সৃজন, মুক্তি দিয়েছি মা।' ■

সুজানা চৌধুরী, চতুর্থ শ্রেণি, প্রভাতী শাখা, ভিকারুননেছা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

বৃষ্টিতে ভেজা

লিটন ঘোষ জয়

‘ইতি তুমি এখনো পড়তে বসোনি?’

দিদির একথা শুনে ইতি বলল, ‘দিদি বসছি তো।’

‘কখন বসবে; একটু পরই তো বলবে– দিদি আমার ঘুম পাচ্ছে! তোমার তো আবার পড়তে বসলেই ঘুম পায়। যাও তাড়াতাড়ি গিয়ে পড়তে বসো। সব সময় শুধু টেলিভিশন দেখা তাই না?’ ইতি অথৈ দিদির ভয়ে জলদি করে পড়তে বসল। কিন্তু এখন ওর পড়তে ইচ্ছে করছে না। একটু পরেই টিভিতে টম অ্যান্ড জেরি শুরু হবে। ধুর!

আর ভালো লাগে না; সারাক্ষণ শুধু পড়া আর পড়া। যখনই টেলিভিশনের সামনে বসি, তখনই দিদির এক কথা– ইতি যাও পড়তে বসো, ইতি যাও হোমওয়ার্ক শেষ করো। দিদি কখনো বোঝে না; আমার কার্টুন দেখতে...

পাশের রুম থেকে অথৈ দিদি বলল, 'ইতি তুমি কী পড়তে বসেছ?'

'হ্যাঁ বসেছি তো দিদি।'

'কই তোমার পড়ার শব্দ তো আমার কানে আসছে না। একটু জোরে জোরে পড়ো, শুনি কী পড়ছ।'

ইতি দিদির কথামতো এবার জোরে জোরে পড়তে লাগল– 'ভোর হল দোর খোলো, খুকুমণি ওঠো রে!, ঐ ডাকে যুঁই-শাখে, ফুল-খুকি ছোটো রে!'

অথৈ দিদি ইতির পড়া শুনে বলল, 'এই তো এভাবেই জোরে জোরে পড়তে হয়। আরে, জোরে জোরে না পড়লে কী পড়া মনে থাকে!'

কিছুক্ষণ পর আবার ইতির পড়ার শব্দ থেমে গেল। দিদি এবার রেগে গিয়ে বলল, 'ইতি, ইতি তুমি কী ঘুমিয়ে পড়লে?'

ইতি বলল, 'কই দিদি! আমি তো পড়ছি।'

'পড়ছ ভালো কথা, তা শব্দ শোনা যাচ্ছে না কেন?'

'দিদি জোরে জোরে পড়তে আমার ভালো লাগে না।'

ইতির একথা শুনে দিদি পাশের রুম থেকে এসে বলল, 'তা লাগবে কেন? জোরে জোরে গান গাওয়ার সময় তো ভালো লাগে!'

ইতি আর কিছু না বলে– দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

দিদি বলল, 'কী হলো? ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছো কেন? তাড়াতাড়ি পড়া কমপ্লিট করো। আমি তোমার জন্য গরম গরম লুচি তৈরি করে আনছি।'

ইতি লুচি খাওয়ার কথা শুনে খুশিতে হাততালি দিয়ে বলল, 'কী মজা! লুচি খাব।'

অথৈ দিদি ইতির লাফালাফি দেখে বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে, অনেক ফড়িংয়ের মতো লাফালাফি হয়েছে। এবার তুমি মনোযোগ দিয়ে হোমওয়ার্ক শেষ করো, আমি আসছি।'

আজ সকাল থেকেই টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ইতি দিদির সাথে স্কুল থেকে ফিরে সোজা ঘরে ঢুকেছে। বৃষ্টির কারণে আজ ইতির বাইরে বের হওয়া বন্ধ। দিদি বলেছে– বৃষ্টির মধ্যে বাইরে যাবে না।

সারাদিন গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হবার পর বিকাল থেকে অঝোরধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। ইতি জানালাতে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির ঝরে যাওয়া দেখছে। দেখছে– জানালার একটু দূরে আমগাছে শালিক পাখিগুলো ভিজতে ভিজতে একবার যাচ্ছে; একবার আসছে। আমগাছে আমে ভরে গেছে; মাঝেমধ্যে দমকা বাতাস হলে একটা দুইটা করে আম পড়ছে। ইতি সবকিছু অপলক চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছে। ইতি জানালা দিয়ে হাত বের করে বৃষ্টির জলে ভিজিয়ে নিচ্ছে। ওর ছোটো হাত, সেজন্য বেশি দূর যাচ্ছে না; তাই ভালো করে বৃষ্টি ছুঁতে পারছে না। ইতির ভীষণ ইচ্ছে করছে বৃষ্টিতে ভিজতে কিন্তু দিদির জন্য...

হঠাৎ দিদির গলা শুনতে পেয়ে ভয়ে ইতি জানালা থেকে সরে আসলো। তারপর দিদির সামনে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দিদি ইতিকে বলল, 'কী হলো ইতি, তোমার কি মন খারাপ?'

'কই না তো দিদি।'

দিদি বলল, তাহলে মুখটা এমন গোমড়া করে আছো যে? আচ্ছা ইতি চলো, আমরা বৃষ্টিতে ভিজতে নামি।'

ইতি দিদির কথা শুনে বিশ্বাস করতে পারছে না। অবাক হয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, 'কী বললে দিদি! তুমি আমাকে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে নামবে?'

অথৈ দিদি হাসতে হাসতে বলল, 'হ্যাঁ।' তারপর ইতির হাত ধরে দিদি বৃষ্টিতে ভিজতে নেমে গেল। ■

সংখ্যার খেলা

তারিক মনজুর

'পিলটু, আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না!'

'হ্যাঁ দাদু, সত্যি। মোবাইলে একসাথে কথা বলা যাবে। আর সবার ছবিও দেখতে পাব।'

প্রমাণ পাওয়ার জন্য ভাষা-দাদুকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো। এর মধ্যে নেহা ও বিনুর সাথে পিলটু আলাপ করে রাখল। মোবাইলে কী করে একসাথে কথা বলা যায়, সেটা ওরা কয়েকদিন আগেই শিখেছে। এর মধ্যে নিজেরা কথাও বলেছে।

সন্ধ্যায় সবাইকে একসাথে ফোনে দেখতে পেয়ে ভাষা-দাদু আনন্দে ফেটে পড়লেন। বললেন, 'বিজ্ঞান কতদূর এগিয়েছে ভাবা যায়? আমার মোবাইলে সবাইকে দেখতে পাচ্ছি!'

করোনা ভাইরাসের কারণে এখন কঠিন সময় যাচ্ছে। অনেকদিন কারো সাথে কারো দেখা হচ্ছে না। এই অবস্থায় কীভাবে মোবাইলে সবাই মিলে ভিডিও আলাপ চালানো যায়, সেটা পিলটুর বাবা পিলটুকে শিখিয়ে দিয়েছেন। এখন পিলটুর কাছ থেকে সবাই শিখে নিয়েছে। তবে বিতু, শাফিরা ভিডিও আলাপে আসতে পারেনি। ওদের ফোনে সেই সুযোগ নেই।

'৫০ বছর আগের মানুষ কি জানতে পেরেছিল এভাবে একসাথে কথা বলা যাবে?' ভাষা-দাদুর প্রশ্নের মধ্যে উচ্ছ্বাস।

'আমরা কিন্তু দাদু পাঁচ দিন আগেই জানতে পেরেছি!' নেহা বলে।

'না, না, পাঁচ দিন না, চার দিন আগে জেনেছি!' বিনু বলে।

'আচ্ছা, ৫ হোক আর ৭ হোক, সংখ্যা নিয়ে তর্ক করতে হবে না। আমরা বরং সংখ্যা নিয়ে একটা খেলা খেলি।'

খেলার কথা শুনে বিনু সবচেয়ে খুশি হলো।

করোনার কারণে এমনিতেই বাইরে যাওয়া হয় না। আর একসাথে খেলা তো দূরের কথা। বিনু বলল, 'মোবাইলে খেলা! দাদু, তুমি তাড়াতাড়ি শুরু করো।'

'খেলার নিয়ম আগে বলে দেই। সংখ্যা দিয়ে শব্দ বলতে হবে। যেমন, ১ দিয়ে পৃথিবী। কারণ পৃথিবী একটা। এখন ১ দিয়ে আর কী হয়, অন্য কেউ বলো।'

'আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না দাদু।' বিনু বলে।

ভাষা-দাদু বললেন, 'আর কী কী একটা আছে, ভাবো।'

'আমি বুঝতে পেরেছি!' নেহা দেরি না করে বলল, 'পৃথিবী একটা। তাই ১ দিয়ে হয় পৃথিবী। একইভাবে সূর্য একটা। তাই ১ দিয়ে সূর্যও হবে। তাই না দাদু?'

'হ্যাঁ, তাই। আর কেউ ১ দিয়ে কিছু বলতে পারবে?'

বিনু বলল, 'আমি বললাম চাঁদ। কারণ চাঁদ একটা।'

নেহার ভাই নাবি ফোনের কাছে ছিল। সে পাশ থেকে বলে উঠল, 'আমি বললাম লেজ!'

নাবির কথা শুনে সবাই খুব হাসতে লাগল। 'কিন্তু উত্তরটা কি হয়েছে?' বিনু জিজ্ঞেস করে।

'হবে না কেন? নিশ্চয়ই হয়েছে! কারণ লেজ তো একটাই হয়।' ভাষা-দাদু বললেন।

পিলটু বলল, 'আমি বললাম মাথা। কারণ মাথাও তো একটা।'

এরপর খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। ভাষা-দাদু বললেন, '১ দিয়ে আর কিছু কেউ বলতে চাও? না পারলে আসো এখন ২ দিয়ে শুরু করি।'

নেহা বলল, '২ দিয়ে হয় চোখ। কারণ চোখ দুইটা।'

'২ দিয়ে হয় হাত। ২ দিয়ে হয় পা।' পিলটু একসাথে দুইটা বলল।

বিনু বলল, '২ দিয়ে কান। ২ দিয়ে শিং।'

এরপর সবাই আবার চুপচাপ। দাদু বললেন, '২ দিয়ে না পেলে আমরা তিন-এ যেতে পারি।'

নেহা বলল, '৩ দিয়ে কি ত্রিভুজ হবে, দাদু?'

'কেন হবে না?'

'তাহলে আমি বললাম রিকশার চাকা!' বিনু বলেই ফিক করে হেসে দেয়। সবাই দেখল, ঠিকই তো। রিকশার তিন চাকা।

বিজ্ঞানী পিলটু বলল, 'আমি বলতে চাই পদার্থের তিন রূপ – কঠিন, তরল আর বায়বীয়।'

ভাষা-দাদু বললেন, 'বাহ্।'

নেহা বলল, '৩ দিয়ে হয় ত্রিফলা – আমলকি, হরিতকী, আমলা।'

'৩ দিয়ে হয় ফ্যান। ফ্যানের তিনটা পাখা।' নেহার ভাই নাবি পাশ থেকে বলল।

'৩ দিয়ে ঘড়ির কাঁটাও হয়।' বিনু বলে।

'আর কী হতে পারে ৩ দিয়ে? আর কী হতে পারে?' বিনু যখন এ রকম বিড়বিড় করছে, তখন ভাষা-দাদু বলে উঠলেন, '৩ দিয়ে কিন্তু তিন প্রজন্ম বা তিন পুরুষও হয়।'

পিলটু প্রস্তাব দিল, 'এবার চারে যাই।'

বিনু বলল, 'পিলটু মনে হয় ৪ দিয়ে আগেই ভেবে রেখেছে!'

পিলটু বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। ৪ দিয়ে তোমরাই বলো।'

'৪ দিয়ে চতুর্ভুজ।' নেহা বলে।

'৪ দিয়ে গরুর পা।' বিনু বলে।

বিনু জানতে চায়, '৪ দিয়ে কি হালি বলা যাবে দাদু? এক হালি মানে তো চারটা।'

ভাষা-দাদু বললেন, 'হ্যাঁ, ৪ দিয়ে হালি বলা যাবে। ৪ দিয়ে বলা যাবে চারদিক– পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ।'

পিলটু বলল, 'আমি ৪ দিয়ে বলার সুযোগ পাইনি। ৫ দিয়ে সব আমিই বলব। ৫ দিয়ে হয় পঞ্চভুজ, ৫ দিয়ে হয় পাঁচ ইন্দ্রিয়, পাঁচ আঙুল, পাঁচ মহাসাগর...'

'৬ দিয়ে তবে আমি বলি', নেহা বলতে শুরু করে, '৬ দিয়ে হয় ষড়ভুজ, ষড়ঋতু...'

এবার বিনু বলে, '৬ দিয়ে পিঁপড়ার পা হয়!'

পিলটু বলে, 'ক্রিকেট খেলার এক ওভারে ৬টা বল হয়।'

'৬ দিয়ে যথেষ্ট হয়েছে', ভাষা-দাদু বলেন, 'এবার তবে সাতে যাওয়া যাক।'

'৭ দিয়ে হয় সপ্তাহ।' নেহা বলে।

বিনু বলে, '৭ দিয়ে সাত সুর – সা রে গা মা পা ধা নি।'

ভাষা-দাদু যোগ করেন, 'আকাশের সাতটি তারাকে কিন্তু সপ্তর্ষি বলে। আবার ৭ দিয়ে পৃথিবীর সাত আশ্চর্য হয়।'

পিলটু বলে, '৭ দিয়ে সাত মহাসাগর হয়।'

নেহা বলল, '৭ দিয়ে সাত ভাই চম্পা হয়।'

এরপর সবাইকে চুপ থাকতে দেখে নাবি পাশ থেকে বলে উঠল, '৮ দিয়ে আমি বলতে পারব। ৮ দিয়ে হয় মাকড়সার পা।'

পিলটু বলল, '৮ দিয়ে অক্টোপাসের পাও হয়। ৮ দিয়ে গ্রহ হয়। ...জানো তো সবাই, প্লুটো এখন গ্রহের তালিকায় নেই।'

প্লুটো গ্রহের তালিকায় নেই! সবাই একটু অবাক হলেও আপত্তি করে না। কারণ, পিলটু বিজ্ঞানের বিষয় ভালো জানে। কিন্তু ৮ দিয়ে আর কী হয়? সবাইকে থেমে যেতে দেখে দাদু বলেন, '৮ দিয়ে প্রহর হয়। সারাদিনে আট প্রহর। এক প্রহর সমান তিন ঘণ্টা। আবার ৮ দিয়ে অষ্টধাতু হয়। সোনা, রুপা, তামা, পিতল, দস্তা, কাঁসা, সিসা, লোহা – এই আটটা ধাতুকে একসাথে অষ্টধাতু বলে। কিন্তু দাদা ভাইরা, আমাকে যে একটু ফোন রাখতে হচ্ছে। আমি আবার রাতের খাবার একটু আগেই খাই।'

'কিন্তু আমাদের খেলা?' বিনু জানতে চায়, 'খেলা কি তাহলে বন্ধ হয়ে যাবে?'

দাদু বললেন, 'না, তোমরা খেলতে থাকো।' ■

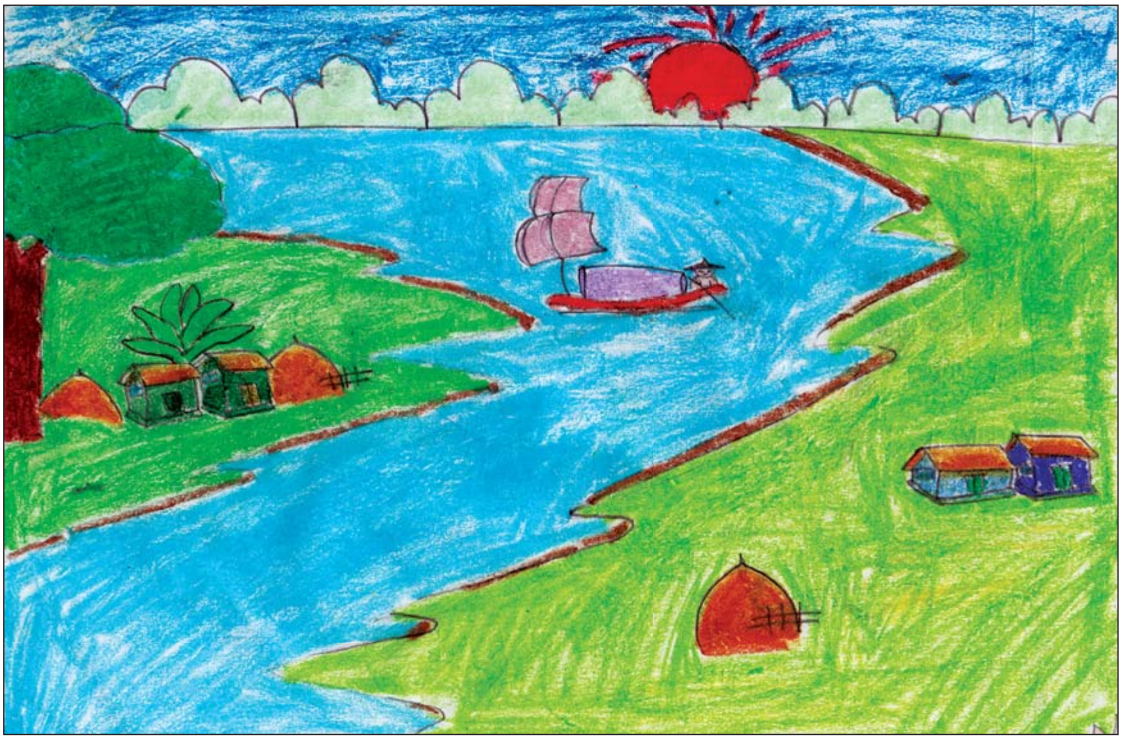

মো. ফাহমিদ হাসান সিয়াম, সপ্তম শ্রেণি, হাজী আলাউদ্দিন রেসিডেন্সিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

গল্প

ঘুড়ি ওড়ার আনন্দে

জুয়েল আশরাফ

আমি তখন তোদের চেয়েও খানিক ছোটো, পটরপটর কথা বলতে শিখে গিয়েছি তখন... ।

রকি পাখাল ভাইয়ের দিকে বিরক্ত হয়ে তাকাল। ওর দৃষ্টিতে পরিষ্কার লেখা- 'চারবার পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছেন। আর দুটি বছর থাকলে স্কুল ব্যাগ কাঁধে নিয়ে আমাদের সাথি হতে পারতেন। নিজেকে কত বড়ো ভাবেন? তালগাছ সমান?' রকির নীরব কথাগুলো শুধু আমিই পড়তে পারি। তাই একটু ভড়কে গেলাম। ও আবার ঝামেলা না করে, শান্ত রাখতে ওর পিঠে হাত বোলালাম। আমরা এসেছি পাখাল ভাইয়ের কাছে ঘুড্ডি বানানো শিখতে। পাড়ায় পাখাল ভাইয়ের ঘুড্ডি বানানোর কৃতিত্ব জানতে পারলাম খোশালের কাছে। তাই খবর পেয়েই চলে আসি। আমরা বলতে আমি, রকি, খোশাল, ছানি আর গালিব। রকি তো আসতেই চাইছিল না। ওর ধারণা পাখাল ভাই কাজের চেয়ে অকাজ বেশি করবেন। নিজে যা না তা নিয়েই বাহাদুরি। বিশ্ব পণ্ডিত লোক, সবজান্তা এমন ভাবখানা মুখের। এমন মানুষের কাছ থেকে বিনা পয়সায় চিড়ার মোয়া পাওয়া গেলেও খাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু খোশালটা একপ্রকার তোড়জোড় করেই ধরে নিয়ে এলো। ভালো ঘুড্ডি বানাতে হলে পাখাল ভাইয়ের হাতের জুড়ি নেই। আর এসেই আমরা প্রথমে খেলাম ধমক। পাখাল ভাই প্রচণ্ড গর্জে উঠে বললেন, কী গ্রাম্য পোলাপান তোরা! ঘুড়িকে ঘুড্ডি বলিস? ঘুড়ির মান-সম্মান সব খাবি।'

ঘুড়িকে ঘুড্ডি বলতেই আমরা আরাম পাই। তাতে তার মানসম্মান থাক ছাড়া যাক, আমাদের কিছু আসে যায় না। কিন্তু এই কথা জোর গলায় পাখাল ভাইকে

আমরা বলতে পারি না। কারণ আমাদের কাজ উদ্ধার দিয়ে কথা। শব্দ ব্যবহারের প্রতিযোগিতা আমাদের কাজ না।

পাখাল ভাই বললেন, ‘আমি ছিলাম পাড়ার দস্যি, হাড় ডানপিটে, কিন্তু ঘুড়ি ওড়ানোর রাজা। আমার হাতের বানানো মাঞ্জা দেওয়া সুতোয় ওড়ানো ঘুড়ি আকাশে রীতিমতো রাজ করত।’

খোশাল খুশিতে গদগদ হয়ে জানতে চাইল, পাখাল ভাই আপনে কয়ডা ঘুড্ডি চিৎপটাং করতেন?’

এই প্রশ্ন না করাই খোশালের জন্য ভালো ছিল। যেমন আগ্রহ নিয়ে জ্বলজ্বল চোখে জিজ্ঞেস করেছে, প্রশ্ন করার পর ধমক খেয়ে মুখ পেঁচার মতো হয়ে গেল। পাখাল ভাই বিরক্ত মুখে বললেন, ‘নাহ্ তোদের নিয়ে আর পারছি না। ঘুড়ি বানানো শেখানোর আগে তোদের শব্দ ব্যবহার শেখাতে হবে। ঘুড়িকে ঘুড্ডি বলবি না।

আমরা সবাই চুপ করে থাকলাম। শুধু রকি কটমট চোখে পাখাল ভাইয়ের দিকে তাকাচ্ছে। বেলুনের ভেতর বাতাস বেশি ঢুকলে ফেটে যায়, ভয় হচ্ছে রকির রাগ কখন জানি পাখাল ভাইয়ের ওপর ফেটে পড়ে। ধৈর্য্য ধরে ঘুড্ডি তৈরির অপেক্ষায় আছে সবাই। কখন ঘুড্ডি হবে, কখন ওড়াব, বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে- সেদিকে খেয়াল নেই। পাখাল ভাই আছেন নিজের কীর্তি নিয়ে বক্তৃতায় ব্যস্ত।

বিকেলের শেষে দেখা যেত, আকাশে রাজের ঘুড়ি পতপত করে একা উড়ছে। একা। চিৎপটাং হওয়ার ভয়ে কেউ আমার সাথে ঘুড়ি ওড়াত না। বুঝলি?’

রকি দুষ্টুমি সুরে বলল, বুঝলাম। রাজের মতো ওড়াতে গেলে আমাদের কী কী করতে হবে বলেন এবার।’

রকির মুখে ‘রাজ’ কথাটায় পাখাল ভাই যেন আরাম পেলেন। খুশি গলায় বললেন, রাজের মতো ঘুড়ি ওড়াতে গেলে, যা করতে হবে, সেসব ফন্দিফিকির এখন বলব তোদের। ঘুড়ি কেনার সময় অবশ্যই লম্বা যে ঘুড়ির শিরদাঁড়া কাঠিখানি, তা দেখে নিতে হবে সবার আগে। কাঠির দুই দিকের ডগা হতে হবে মাঝের অংশের তুলনায় একটু সরু। মাঝখানটা তাই বলে বেশি মোটা হলে ঘুড়ি উড়াতে বেশি হাওয়া লাগবে। ব্যাপারটা মানুষের মেরুদণ্ডের মতোই, তার সঙ্গে কাঠির অনুপাতের অঙ্কটা একটু করে নিস মনে মনে। আর বাঁকা যে ধনুকের মতো কাঠি, তাকে হতে হবে সরু, হালকা কিন্তু শক্তপোক্ত। ঘুড়ির ভারসাম্য সে-ই রক্ষা করবে।’

এখানে পাখাল ভাই একটু থামলেন। চিন্তিত মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘হ্যাঁ রে, সরু, শক্তপোক্ত, ভারসাম্য শব্দ দিয়ে বোঝাতে গিয়ে কি একটু কঠিন করে ফেললাম? আমার আবার সস্তা শব্দ মুখে আসে না।’

শব্দের আবার সস্তা দাম বুঝলাম না। রকি ফিসফিস করে বলল, ‘স্কুলে বাংলা পরীক্ষায় খারাপ করেছেন। আর আমাদের কাছে বাংলায় পণ্ডিতি...।’ আমি রকির মুখ চেপে ধরলাম। পাখাল ভাইয়ের কানে গেলে সর্বনাশ।

পাখাল ভাই আয়েশ করার ভঙ্গিতে বললেন, ‘এবার পালা সুতা পরানোর। একে ভাবা যেতে পারে ঘুড়ির পেশি! হাওয়ায় ভাসার সময় এই সুতাই মেরুদণ্ডকে সঞ্চালনা করবে। ঘুড়ির যেদিকটা মসৃণ, সেদিকে ধনুক কাঠি আর লম্বা কাঠির ঠিক ক্রসের জায়গায় গিঁট পরিয়ে সেখান থেকে কাঠিকে দুই-তৃতীয়াংশ মাপ নিবি। প্রথম প্রথম স্কেল দিয়ে মেপে নিবি, এরপর আস্তে আস্তে চোখে দেখেই মাপ বুঝে যাবি। এবার এমনভাবে সুতার মাপ নিতে হবে যেন, সেই সুতার মাঝখানটা টেনে ধরলে একটা সমবাহু ত্রিভুজ তৈরি হয়। এরপর সুতার ওই বিন্দু থেকে ঈষৎ নিচে লাটাইয়ের সুতার গিঁটটা বাঁধতে হবে। ভেবে দেখ, কত অঙ্ক, বিজ্ঞান ঢুকে রয়েছে ভিতরে।’

খোশাল বলে উঠল, ‘ওরে বাপরে! একটা ঘুড্ডির ভেতর এত অঙ্ক, বিজ্ঞান ঢুইকা থাকলে আমরা ঘুড্ডি ওড়ামু কখন? থুক্কু ঘুড়ি!’

ঘুড়ির ওপর বিশাল বক্তৃতা দিতে পেরে পাখাল ভাইয়ের চোখ চক চক করতে থাকে। মনে হলো বালিশ এনে দিলে আনন্দে এই মাঠেই ঘাসের ওপর ঘুমিয়ে পড়তেন।

পাখাল ভাই হাই তুলতে তুলতে বললেন, 'যা হোক, আসল কাজ শেষ। অনেক সময় সুতার ভারে ঘুড়ির ভারসাম্য নষ্ট হয়। সেজন্য কিছু টোটকাও রয়েছে। সুতার ওই মাঝখানটা ধরে মাটি থেকে তুললে যদি মাথার দিকে হেলে যায়, তবে নিচের দিকে মাপ বুঝে গিঁট মারতে হবে। তেমনই নিচে হেলে থাকলে উপরের দিকে গিঁট দিতে হবে।'

খোশাল বলল, 'হ গিট্টু মারুম।'

'যদি ডানদিকে হেলে থাকে তবে ওই ধনুক কাঠির বামদিক বরাবর কাগজের ছোটো টুকরো মুড়ে দিতে হবে, একে বলে 'কানি'। কান মুড়ে দেওয়া থেকেই এসেছে এই শব্দ।'

অনেকক্ষণ পর রকি মুখ খুলল। ফিসফিস করে আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, একদম বিশ্বাস করবি না। বানিয়ে বানিয়ে বলছে।

পাখাল ভাই খোশ মেজাজে বললেন, 'তাহলে আর কী, এবার ওড়া ঘুড়ি, ওড়া আকাশে।'

খোশাল উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'হ ঠিক কইছেন পাখাল ভাই। একদম ঠিক কথা। আপনের কথামতো ঘুড্ডি বানাইতে পারলে আমাগো ঘুড্ডি আকাশে রাজ করব।' এরপর শব্দ ব্যবহার মনে পড়ায় জিভ কাটল। তারপর বলল, 'অনেকক্ষণ বইসা থাকতে থাকতে মাঞ্জাটা ধইরা গেছে।'

হঠাৎ যেন কোনো কিছু মনে পড়ায় পাখাল ভাই বললেন, 'কেউ যাস না। ঘুড়ির ব্যাপারে আরো কিছু বাকি আছে।'

পাখাল ভাই রহস্যময় হাসি হাসলেন। যেন গোপন কিছু বলবেন। খোশাল বসে পড়ল। 'তোরা কী ভাবছস আমি বোকা পাখাল নাকি? মাঞ্জার কথা বলব না? কাচের গুঁড়ো লাগিয়ে কাটাকুটি, কাটাকাটির খেলা করে কত ঘুড়ি শেষ করে দিলাম। আমার ঘুড়ি নিয়ে আমি একাই রাজ করতাম আকাশে।'

রকি বলল, 'আচ্ছা পাখাল ভাই আমার কিছু প্রশ্ন আছে। মাঞ্জা শব্দটা কোত্থেকে এসেছে?'

পাখাল ভাই সিরিয়াস ভঙিতে বললেন, 'কোমরকে কেউ কেউ অশুদ্ধ ভাষায় মাজা বলে, কেউ কেউ মাঞ্জা বলে। যেমন একটু আগে খোশাল কোমরকে মাঞ্জা বলল। মাঞ্জা শব্দটি এভাবেই এসেছে।'

'ঘুড়ি- শব্দটি কোত্থেকে এসেছে?'

'ঘড়ি থেকে ঘুড়ি শব্দের উৎপত্তি।'

'লাটাই শব্দ কোত্থেকে এসেছে?'

'গলায় যেই টাই পরা হয়, সেই টাই থেকে লাটাই শব্দ।

পাখাল ভাইয়ের উত্তরগুলো শুনে আমরা আর নিজেদের ধরে রাখতে পারলাম না। বিকেল বেলায় এসেছিলাম ঘুড়ি ওড়াবার আনন্দে, ঘুড়ি ওড়ানো হলো না, কিন্তু নরম ঘাসের ওপরে খিলখিল করে হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের উপর গড়িয়ে গেলাম গোধুলীর মাঠে। ■

জাতীয় পতাকা

ফারুক হোসেন

পতাকা শুধু কি টুকরো কাপড়, বানিয়ে গতানুগতিক,
দেশের পতাকা, জাতীয় পতাকা, একটি দেশের প্রতীক।
পতাকা হচ্ছে দেশ ও জাতির ঐতিহ্যের ধারক,
দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ এবং ত্যাগের স্মারক।
পতাকা প্রতীক সার্বভৌম, মুক্তি ও স্বাধীনতার,
জাতীয় চেতনা, সংস্কৃতি আর পরিচয় স্বকীয়তার।

আয়তক্ষেত্র বাংলাদেশের পতাকার মূল আকার,
সবুজ ভিত্তি, তার মাঝে লাল কাঠামো যে বৃত্তাকার
সবুজ হচ্ছে বাংলাদেশের প্রকৃতির সম্মিলন,
তার সাথে চির তারুণ্যে গাথা সুদৃপ্ত অনুশীলন।
বৃত্তের লাল বাংলাদেশের সময় সূর্যোদয়ের,
আত্মত্যাগের রক্ত প্রতীক, প্রতীকযুদ্ধ জয়ের।

এই পতাকার জন্য রয়েছে সুনির্দিষ্ট বিধান
সেই সব মেনে পরিমাপ আর ব্যবহারই প্রণিধান।
পতাকার মাঝে মূর্ত দেশের মুক্তির মহানায়ক,
বাংলাদেশের কোটি বাঙালির আজীবন পরিচায়ক।
যত সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ, বিজয়ের স্মৃতিবাধন,
লাল-সবুজের পতাকা জানাই শ্রদ্ধায় অভিবাদন।

সবুজ সোনার বাংলাদেশ

সোহরাব পাশা

এই পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা
সবুজ সোনার বাংলাদেশ
চোখ জুড়ানো আলোয় ভরা
সুনাম যে তার নাইকো শেষ
পাখির ডাকে ফুলের বাসে
ঘুম ভেঙে যায় খোকা-খুকুর
ঝিলের জলে শাপলা ভাসে
জল টলমল পদ্মপুকুর
একটি ডাকে সাড়া দিয়ে
জোট বেঁধে যায় সব জনতা
লড়াই করে আনলো তারা
একাত্তরে স্বাধীনতা
বিশ্বজোড়া নাম কুড়ালেন
ইতিহাসে তিনি অমর
সোনার কলম দিয়ে লেখা
জাতির পিতা শেখ মুজিবুর।

ইস্টিকুটুম

রাকিব আজিজ

ইস্টিকুটুম আসলে বাড়ি
যায় যে পরে ধুম,
রান্নাঘরে ব্যস্ত থাকে
হয় না কারো ঘুম।
কেউ বা কাটে মাছের পেটি
কেউ বা পুকুর ঘাটে ,
কেউ বা করে মোরগ জবাই
কেউ বা মরিচ বাটে।

হই হুল্লোর সারা বাড়ি
দাদুর গলায় কাশি ,
তাইনা দেখে খোকাখুকির
মুখে মুচকি হাসি।
শান্তি যখন রাশি রাশি
হাসি খুশি সারা বাড়ি
লাল শাড়িটা পরে এসে
নাচে দাদি বুড়ি।
রাত যখন গভীর হলো
খানাপিনা শুরু,
সব শেষে ঘুমোতে হবে
ডাকে দাদু বুড়ো।

পুতুল বিয়ে

আলম শামস

আমার বোনের ছোট্ট পুতুল
নামটি হলো বেলা
রোজ বিকেলে তাকে নিয়ে
করতে থাকে খেলা।
সোমবারে তার বিয়ে হবে
দাওয়াত দিল মাকে
মা যাবে তার বিয়ে খেতে
সঙ্গে নিবে কাকে?
নজরানা সে দিবে গাড়ি
আরো দিবে শাড়ি
বিয়ে খেতে গিয়ে দেখে
জামাই তো নেই বাড়ি।

করোনার কবিতা

করোনায় করনীয়

ড. নূরুল হুদা মামুন

করোনাময় দুঃসময়ে
কেউ হব না দুস্থ,
তুমি আমি থাকলে ভালো
হবে জাতি সুস্থ।

হাত ধুয়ে নাও সাবান দিয়ে
মাস্ক পরে নাও মুখে,
অযথা আর বাহিরে নয়
ঘরে থাকো সুখে।

আম আনারস লেবু খাবে
গরম পানি মাঝে,
বাসায় বসে ব্যায়াম করবে
পড়বে সকাল সাঁঝে।

পাঠ্যবইটা পড়ার সাথে
পড়বে মজার গল্প,
দেশ-বিদেশের রাখবে খবর
হোক না সেটা অল্প।

বাবা-মায়ের কাজের সাথে
হবে সহযোগী,
প্রভুর কাছে প্রার্থনাতে
হবে মনোযোগী।

করোনারি বৈরী

তরুণ ইউসুফ

নানা রঙে, নানা ঢঙে
মাস্ক হলো তৈরি,
মাস্ক বটে ভয়াবহ
করোনার বৈরী।

করোনার টার্গেট
গলা আর ফুসফুস,
নাকে মুখে মাস্ক পরে
কেন তবে উশখুশ ?

কোন পথে ফুসফুসে
ঢোকে বেটা করোনা,
বোঝে না তো তাই বুঝি
মুখে মাস্ক পরো না ?

সবচেয়ে বড়ো ভুল
অবহেলা করাটা,
জীবনটা নিয়ে কেন
খাবে তুমি ধরাটা?

করোনাকালীন

মো. মেহরাব হোসেন

করোনায় বদ্ধ হয়ে
আছি আমরা বাসায়
সময় কাটছে বন্ধুবিহীন
ঘুড়ি উড়ানো আর পড়ালেখায়।
বেশি বেশি হাত ধুবো
সাবান পানি দিয়ে
নিজে থাকব সচেতন
অন্যকেও দিব জানিয়ে।

সপ্তম শ্রেণি, আইডিয়াল কিন্ডারগার্টেন, গাজীপুর

গল্প

টিকলু টোকাই

মিজানুর রহমান মিথুন

–কীরে টিকলু? তুই আবার কাঁধে ঝোলা নিয়ে টোকাইয়ের কাজ করছিস?

শফিকুর রহমান সাহেবের এই কথা শুনে টিকলু একটু ঘাড় বাঁকিয়ে দেখল- এ কথা তাকে কে বলেছে। এক পলক দেখে কথার জবাব না দিয়েই ভোঁ দৌড় দিয়ে ডাস্টবিনের কাছে গেল।

পথে দেখা হলে টিকলু শফিকুর রহমান সাহেবকে সালাম দেয়। বেশ ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। টিকলু তাকে স্যার বলে সম্বোধন করে।

টিকলু আজ কথা না বলার জন্য শফিকুর রহমান দুটো কারণ বের করেছেন। এর প্রথম কারণ হচ্ছে-আরো চার-পাঁচজন টোকাই কলোনির মধ্যে রয়েছে। তাদেরকে পেছেনে ফেলে টিকলু কলোনির কর্নারের ডাস্টবিনের কাছে যাবে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে- টিকলুকে শফিকুর সাহেব আজিমপুর রসুলবাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন, সেই সঙ্গে একটি মুদি দোকানে তিন বেলা খাওয়া থাকাসহ মাসিক এক হাজার টাকা বেতনে চাকরিও দিয়ে ছিলেন। সেই চাকরিটি ও লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়া।

শফিকুর রহমান সাহেবের সঙ্গে টিকলুর পরিচয় হয়েছিল মাস দুয়েক আগে। তখন টিকলু রিকশা চালাত। টিকলুর রিকশায় আজিমপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে ফুলার রোডের বাসায় গিয়েছিলেন শফিকুর সাহেব। রিকশায় যেতে যেতেই তার সঙ্গে টিকলুর পরিচয় হয়।

–তুমি এতটুকুন মানুষ, ভালোই তো রিকশা চালাও।

–হু, স্যার, ভালো চালাইতে চ্যাষ্টা করি। নইলে তো আমরার রিসকায় কেউ চড়ত না। এমনিতেই আমি ছোড মানুষ। এই অল্প কয় দিনের মধ্যেই এই আজিমপুর এলাকার অনেকেই আমারে চিন্ন ফালাইছে। অহন আমার ক্ষ্যাপের অভাব হয় না।

–তোমার গ্রামের বাড়ি কোথায়?

–স্যার আমগোর কোনো গ্রামের বাড়ি নাই। ঢাকায় জন্ম, এই ঢাকাই সব।

–ভালো কথা, তোমার বাসা কোথায়?

এবার বাসার কথা শুনে টিকলু ঘাড় ঘুড়িয়ে শফিকুর রহমান সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলে,-

–ঢাকাতেই বড়ো হইছি। স্যার এই ঢাকাতেই আমার সব কিছু। পলাশির মোড়ে বুয়েটের কোনায় ফুটপাতে রাইতে ঘুমাই। আর সকাল অইলেই সারা শহর আমার ঘর অইয়া যায়।

টিকলু এই বলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সামনের দিকে দ্রুতবেগে রিকশায় টান মারে। ছোটো হওয়ায় টিকলুর রিকশায় প্যাডেল মারতে কষ্ট হয়। হেলে দুলে তাকে রিকশা চালাতে হয়।

টিকলু-শফিকুর রহমান সাহেবের সঙ্গে কথা চলতে থাকে।

–তোমাকে আমি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে চাই। লেখাপড়া করবে তুমি?

এই কথা শুনে টিকলুর চোখ-মুখ আনন্দে চকচক করে ওঠে। জবাবে টিকলু বলে-

– হু, স্যার লেখাপড়া করমু। তয় স্যার লেখাপড়া করতে গেলে তো রিকশা চালানো ছাইড়া দিতে হবে। তাইলে আমি খামু কী?

– সব ব্যবস্থা আমি করব তুমি লেখাপড়া করবে কী-না তাই বলো।

–হুম, স্যার করবার চাই।

এরপর একদিন টিকলুকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন শফিকুর রহমান সাহেব।

দুই

পলাশি সরকারি আবাসিক এলাকার ডাস্টবিনে ময়লা ছালাছালি করছে টিকলু। হঠাৎ অনুভব করল পেছন থেকে কে যেন টিকলুর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে শফিকুর রহমান সাহেবকে দেখতে পায়। তাকে দেখে টিকলু হকচকিয়ে যায়। এরপর মাথা নিচু করে শফিকুর রহমানকে সালাম দেয়।

–তুমি কি লেখাপড়া আর দোকানের কাজ ছেড়ে দিয়ে আবারো টোকাইয়ের কাজ শুরু করেছ? টিকলু মাথা নিচু করে আছে। কোনো কথা বলছে না।

–না, টিকলু তোমার কাছ থেকে এমনটা আশা করিনি।

এবার টিকলু অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে বলে,-

–স্যার আমি টোকাইয়ের কাজ কইরা বড়ো হইছি। টোকাইয়ের কাজ ভালো না লাগায় রিকশা চালানো শুরু করছিলাম। এরপর আপনি আমারে স্কুলে ভর্তি করায় দিলেন। স্কুল প্রথম প্রথম ভালো লাগলেও অহন আর স্কুল ভালো লাগে না। স্কুলের স্যারে কড়া শাসনে রাহে। যে দোকানে কাম ঠিক কইরা দিছিলেন তারা কাজের জন্য চাপ দেয়। এগুলা এহন আর আমার ভালো লাগে না স্যার। স্যার আমারে নতুন একটা স্কুলে ভর্তি কইরা দেন। যে স্কুলে কোনো শাসন বারণ নাই। শুধু আনন্দে থাকব।

টিকলুর কথা শুনে শফিকুর রহমান সাহেব বললেন,

–হ্যাঁ, টিকলু তোমাকে এমন একটা স্কুলেই ভর্তি করিয়ে দেবো, সে স্কুলের নামও 'আনন্দ' স্কুল। আমরা তোমাদের মতো শিশুদের নিয়ে গত মাস থেকে এই স্কুলটা চালু করেছি।

এ কথা শুনে টিকলু আনন্দে হেসে দিল। ■

গল্প

ছোটো সাহেবের অসুখ

জনি হোসেন কাব্য

ভাতগুলো গলা দিয়ে নামছে না রাবুর। অথচ পুঁটিমাছের ঝোল খুব পছন্দ তার। অন্যদিন এটি পেলে চোখ বুজে গপাগপ গিলত সে।

ভাবছো রাবু কে? ওর কিন্তু আরো একটি নাম আছে। রাবেয়া। খালামনি রাবু নামেই ডাকেন। মেয়েটির বয়স দশ বছর। মিসেস জাহানারা বেগমের বাসায় কাজ করে সে। মা-বাবা নেই, এতিম। খালামনি জাহানারা বেগমই তার সবকিছু। এ বাসাটির টুকিটাকি সকল কাজই রাবু করে। ঘর-মোছা, চেয়ার-টেবিল পরিষ্কার করা, থালা বাটি মাজা, তরিতরকারি কাটাসহ কত্ত কী কাজ তার!

কাজের ফাঁকে ফাঁকে দরজার পেছনে লুকিয়ে ছোটো সাহেবের খেলা দেখে রাবু। রিমোট-কন্ট্রোল প্লেন দিয়ে পাশের বাসার বাচ্চাদের সঙ্গে কী যে মজা করে খেলে সে! রাবুরও খুব ইচ্ছে করে তাদের সঙ্গে খেলতে। খালামনির ভয়ে পারে না।

এ বাসায় রাবু যেদিন প্রথম এসেছিল সেদিন ছোটো সাহেবের সঙ্গে খেলেছিল। তাকে ভাইয়া বলে ডেকেছিল সে। তা দেখে খালামনি ভীষণ রাগারাগি করে রাবুর সাথে।

ছোটো সাহেব তাদের খেলায় রাবুকে নিতে চায়। মায়ের নিষেধের জন্য পারে না। রাবুকে সে ঠিকই লুকিয়ে লুকিয়ে চকলেট খেতে দেয়। খালামনির আড়ালে ছোটো সাহেবকে ভাইয়া বলে ডাকে রাবু।

হঠাৎ ছোটো সাহেবের কী যেন একটা অসুখ হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি। ডাক্তার ছাড়া অন্য কেউই তার কাছে যেতে পারে না। গেলে নাকি তারও এ অসুখটা হবার সম্ভাবনা থাকবে।

থাকলে থাকুক! ভয় পায় না রাবু। ছোটো সাহেবকে দেখতে যাবেই যাবে। শেষে খালামনির ধমক খেয়ে শান্ত হলো সে। দুপুরের খাবার খেতে গিয়ে তাই গলা দিয়ে ভাত নামছে না তার। ছোটো সাহেব ছাড়া ঘরটা কেমন খালি খালি লাগছে!

ছোটো সাহেবের জন্য রাবুর এ খারাপ লাগা জাহানারা বেগমকে খুব নাড়া দিয়েছিল সেদিন।

কয়েকদিন পর ছোটো সাহেব সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরল। ভয়ে আত্মীয়স্বজন কেউই তাকে দেখতে এল না। পাশের বাসার খেলার সাথিরাও না, উলটো তাকে দেখে পালিয়েছে সবাই। মন খারাপ করে বসে রইল ছোটো সাহেব।

এসব দেখে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন জাহানারা বেগম। মনে মনে ভাবলেন- ইশ! ছেলেটা কত দিন হাসপাতালে ছিল। খেলতে পারেনি। যেই বাসায় ফিরল ভয়ে বন্ধুরা কেউ কাছে আসছে না। পুরোপুরি সুস্থ জেনেও কীসের ভয়! বিপদে পড়লেই বুঝা যায় কে আপন আর কে পর। আহারে, না জানি একটু খেলাধুলা করার জন্য ছেলেটার মন কতই না ছটফট করছে!

হঠাৎ দরজার পেছনে খেয়াল করে দেখলেন, রাবু নিজেকে লুকিয়ে ছোটো সাহেবের দিকে শুকনো মুখ করে তাকিয়ে আছে। রাবুকে ডাকলেন তিনি। জানতে চাইলেন, ছোটো সাহেবের সঙ্গে সে খেলতে চায় কিনা? কোনো কিছু না ভেবেই রাবু খুশিমনে জবাব দিল, 'জি, খালামনি।'

জাহানারা বেগমের চোখ টলমল করে উঠল। ছোটো সাহেবের সঙ্গে মেশার জন্য কী রাগারাগি করেছিলেন সেদিন! অথচ ওর ছোট্টো কোনো বোন থাকলে সুখে-দুঃখে এভাবেই পাশে থাকত।

নিজেকে সামলে নিয়ে জাহানারা বেগম বললেন, 'ছোটো সাহেব নয়, তাকে ভাইয়া বলে ডাকবে তুমি। ওর সঙ্গে যখন খুশি খেলবে। কাল তোমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেব। ঠিকমতো পড়াশোনা করবে। আজ থেকে তুমিও আমার সন্তান।'

মায়ের অমন কথা শুনে দুজনেই মহাখুশি! মুহূর্তেই হাসি-হই-হুল্লোড়-চিৎকার-চেঁচামেচিতে নিশ্চুপ হয়ে থাকা বাসাটি মুখরিত হয়ে ওঠল। ■

গল্প

খাঁচার পাখি

কবির মাহমুদ

শপিংমলে ঢুকেই এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগল আরিয়ান। এটা কিনবে ওটা কিনবে। সামনে যা পায় তা নিয়েই খেলতে থাকে। ওকে সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে মা হামিদাকে। আর হবেই না বা কেন!

ছয় বছরের ছোট্টো আরিয়ান কি আর বুঝে!

শিশুদের মন তো এমনই। শিশুরা উন্মুক্ত পরিবেশে ছুটে বেড়াবেই। যেখানে যায় সেখানেই তারা হইচই করতে ভালোবাসে। আর এটাই স্বাভাবিক।

শিশুদের মন মুক্ত ডানার পাখির মতো। তারা উড়তে চায়, ঘুরতে চায়, খেলতে চায়। শিশুরা জানে না কোনটা ভালো কোনটা মন্দ। তাদেরকে যা বুঝানো হয় তারা তাই বুঝে।

আরিয়ানের এমন চঞ্চলতায় মা হামিদা ধমক দিয়ে বকতে শুরু করলেন।

ধমক খেয়ে টলমল চোখে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে মুখের দিকে তাকিয়ে অশ্রুসিক্ত হাসিতে কপালে চুমু দিয়ে বলে-তুমি আমাকে বকলে কেন মা ? আমি না তোমার আব্বু। আব্বুকে কি কেউ বকে?

আব্বু দুষ্টুমি করলে মাঝে মাঝে একটু বকতে হয়, বললেন হামিদা। আরিয়ান বলল, তুমি না সেদিন শাফিকে ধমক দিয়ে কথা বলায় নীলা আন্টিকে বকেছ। আর আজ নিজেই আমাকে বকছো।

এমন হৃদয় ছোঁয়া মিষ্টি কথা শুনে কোলে তুলে আদরে আদরে মা হামিদা বললেন, কোথাও গিয়ে এমন দুষ্টুমি করতে নেই বাবা। লোকে তোমাকে দুষ্টু বলবে। কেউ আদর করবে না। ভালোবাসবে না।

-তাই।

-হ্যাঁ বাবা।

-বুঝে নিল আরিয়ান।

-ঠিক আছে মা, তাহলে আমি আর এসব করব না।

-কিন্ত আমায় ভালোবাসবে তো!

-হ্যাঁ বাসবো বাবা।

-তুমি তো আমার চোখের মণি।

এভাবে ভালোবাসা দিয়েই শিশুদের কোমল মন কিংবা যে-কোনো মানুষকে বদলানো যায়। ধমক দিয়ে নয়।

আরিয়ান এখন মায়ের কাছে কাছে হাত ধরে ঘুরছে। হঠাৎ ডান দিকে চোখ ফেরাতেই কয়েকটি পাখি খাঁচায় বন্দি দেখে চমকে উঠল! খাঁচার নিকট একটি সাদা কাগজের লেখাগুলো বানান করে পড়ে বুঝতে পারল যে পাখিগুলো বিক্রয়ের জন্য।

-বিক্রয় কী তা জানে না আরিয়ান।

-মাকে জিজ্ঞেস করল, মা বিক্রয় মানে কী?

-বিক্রয় মানে তুমি চাইলে বা তোমার পছন্দ হলে তুমি টাকা দিয়ে কিনে নিতে পারবে।

-অহ! তাই।

-হ্যাঁ বাবা।

আরিয়ান কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলে-

-আচ্ছা মা, পাখিগুলো বন্দি কেন?

-পাখি তো বনে থাকবে। ওদের বাসা বনে।

-ওরা তো বনকে ভালোবাসে। তুমি না বলেছ, বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা -মাতৃক্রোড়ে। যাকে যেখানে মানায় সেখানেই তাদের থাকা উচিত। পাখিকে কি খাঁচায় মানায় বলো? পাখিকে খাঁচায় বন্দি রাখা পাপ, অন্যায়। ওরা কি জানে না মা?

-ওরা বিক্রি করে টাকা পাওয়ার জন্য বন্দি করে রেখেছে বাবা।

-কিন্তু এটা তো পাপ, অন্যায় মা।

-তাহলে পুলিশ ওদের ধরে নেয় না কেন? তুমি না বলো খারাপ লোকদের পুলিশ শাস্তি দেয়? ওরা তো খারাপ।

-আহা। ছাড়ো তো এসব।

-বাসায় গিয়ে তোমাকে বুঝাবো।

-আর কোনো কথা বলবে না।

-ওকে।

আরিয়ান অনেক কিছু কিনতে এসেছিল।

মা এটা-ওটা অনেক কিছু দেখিয়ে বললেও তখন সে কোনোকিছুই কিনতে চায় না।

মনটা মলিন হয়ে গেছে।

মন পড়ে আছে খাঁচার বন্দি পাখিগুলোর কাছে।

মনে মনে ভাবছে এই পাখিগুলো এখানে কেন? মানুষ এত খারাপ কেন? আহা। তাদের কত কষ্ট হচ্ছে! তাদের তো বন্দি জীবন নয়। আজ ওরা বনে থাকলে কত্ত সুন্দর এ ডাল ও ডাল করে ঘুরে বেড়াতো। আকাশের মুক্ত বাতাসে ডানা মেলে উড়ত। ভোরে ওরা মধুর সুরে কিচিরমিচির করত। তাদের কলকাকলিতে আমাদের ঘুম ভাঙত। আর আজ তারা খাঁচায় বন্দি। না না এ হতেই পারে না। এটা অন্যায়। এটা পাপ!

এসব চিন্তা করতে করতে হঠাৎ দেখে মা শপিংমল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে! ঠিক সেই সময় পিছনে টেনে বলল, মা- আমাকে এই পাখিগুলো কিনে দাও না। আমি আর কিচ্ছু চাই না। প্লিজ মা। আমি পাখিগুলোকে লালনপালন করব। এসব বলে কান্না শুরু করল আরিয়ান। এক সময় বাধ্য হয়ে পাখিগুলোর দাম জানতে চাইলেন হামিদা।

একসাথে পাঁচটি পাখি। আরিয়ান পাঁচটিই নেবে।

এগুলোর দাম কত ভাই ?

পাঁচ হাজার টাকা আপু।

-এত দাম কেন?

-এগুলোকে মানুষের বুলি শেখানো যায়।

-তাই না কি?

-হ্যাঁ আপু!

-ভেনিটি ব্যাগে হাত দিয়ে দেখেন সব মিলিয়ে তার কাছে হাজার তিনেক হবে টাকা আছে।

-তিন হাজার হবে?

-দুঃখিত আপু, কম হবে না। দেখেন না লেখা আছে একদর!

-চলে এসো আরিয়ান, অন্য দিন কিনে দেব বাবা। আজ মায়ের কাছে টাকা নেই।

-না মা অন্যদিন তো এগুলো পাব না। আমি এগুলোই চাই।

আরিয়ানের বায়নায় কাছের একটি এটিএম বুথ থেকে টাকা তুলে পাখিগুলো ক্রয় করলেন হামিদা।

খুব আনন্দে পাখির খাঁচা নিয়ে বাসার দিকে গাড়িতে ছুটল আরিয়ান। গাড়িতে বসে বসে খুব ভাবছে সে!

এরপর গাড়ির গ্লাস খুলে আরিয়ান এক এক করে পাখিগুলোকে ছেড়ে দিচ্ছে। আর দেখছে পাখিগুলোর উড়ে যাওয়ার আনন্দ!

হঠাৎ মায়ের খেয়াল হলো।

একি! আরিয়ান। এত টাকা দিয়ে পাখি কিনে পাখিগুলোকে ছেড়ে দিচ্ছ তুমি?

কেন মা? তুমিই তো আমাকে শিখিয়েছ পাখিকে বন্দি রাখতে নেই। তাই তো আমি পাখিগুলোকে বন্দি জীবন থেকে মুক্তি দিচ্ছি মা। আর মুক্তি দেওয়ার জন্যই তো পাখিগুলো কিনেছি। ওরা কি বন্দি থাকতে চায়, বলো মা? ওদের কষ্ট হয় না।

-আচ্ছা মা আমাকে কেউ বন্দি রাখলে তোমার কেমন লাগবে বলো?

-কষ্ট হবে না!

হামিদা ভারাক্রান্ত হৃদয় আর অশ্রুসিক্ত টলমল চোখে আরিয়ানকে বুকে জড়িয়ে বললেন, না বাবা এসব বলতে নেই! তুমি ছাড়া আমি কী করে বাঁচব! তুমি আমার কলিজার টুকরো !

-হ্যাঁ মা, ওদেরও তো বাচ্চা আছে। ওদের মন কি কাঁদে না! ওরাও তো মা-বাবা। সন্তানকে তোমার মতো আদর করতে ভালোবাসতে চায়! কিন্তু আজ তারা বন্দি!

ওদের অপরাধ কী? ওরা মুক্তি চায় মা, ওরা মুক্তি চায়।

মা মনে মনে ভাবলেন, সত্যিই তো তাই!

আর কোনো কথা না বলে লজ্জিত ও অশ্রুসিক্ত হামিদা হতবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছেন- গাড়ির গ্লাস খুলে এক এক করে পাখিগুলোকে মুক্তি দেওয়ার দৃশ্য।

আর ছাড়া পেয়ে মহানন্দে পাখিগুলোর মুক্ত কণ্ঠে কলকাকলিতে বাতাসে ডানা মেলে উড়ে যাওয়ার আনন্দ তাকেও বিমোহিত করছে!

মুক্তি দেওয়ার আনন্দে হাততালি দিয়ে লাফাচ্ছে ছোট্টো আরিয়ান!

যতক্ষণ দেখা যাচ্ছে ততক্ষণ তাকিয়ে থাকল পাখির মুক্ত ওড়ার দিকে। এক সময় পাখিগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল তার দৃষ্টি থেকে! ■

পুতুল বিয়ে

মীম নোশিন নাওয়াল খান

মানহার পুতুলের বিয়ে। বাসায় ভীষণ ব্যস্ততা। মানহা গত এক সপ্তাহ ধরেই বিশ্রামের সুযোগ পায়নি একদম। মা মণির পুরনো লাল ওড়না কেটে তাতে চুমকি বসিয়ে সেলাই করে পুতুলের বিয়ের শাড়ি বানিয়ে দিয়েছে আপু। মানহার খুব ইচ্ছে ছিল পুতুলকে সোনার গহনা দেবে বিয়েতে। সবার মেয়েকেই তো বিয়েতে সোনার গহনা দেয়। মানহার পুতুলকে না দিলে চলবে কেন? মানহা তাই ভীষণ বায়না ধরেছিল তার পুতুলকেও সোনার গহনা গড়িয়ে দেওয়ার। শেষে তার আবদার রাখতে আপু একটা বুদ্ধি বের করল। পুঁতি দিয়ে মালা গেঁথে দিল পুতুলের জন্য। সেইসাথে টিকলি আর দুল। চিকন তারে পুঁতি গেঁথে হাতের চুড়ি বানিয়ে দিল। মানহার প্রথমে একটুও পছন্দ হয়নি ব্যাপারটা। সে বলেছে, এটা বুঝি সোনার গহনার মতো হলো? সোনার গহনা কী সুন্দর চিকমিক করে।

আপু হেসে বলেছে, এটা সোনার গহনার মতো হবে কেন? এটা তো তার চেয়েও সুন্দর! তুই দেখ একবার- তোর পুতুলের গহনাগুলো কেমন মুক্তোর মতো দেখাচ্ছে! সোনার গহনা এমন মুক্তোর মতো ঝকঝক করে বুঝি?

মানহা তবুও একটু দ্বিধায় ছিল। তারপর আপু বলেছে, তোর পুতুল কি সবার মতো নাকি যে সবাই যা পরবে সেও তাই পরবে? তোর পুতুল সবার চেয়ে আলাদা। তাকে সবার চেয়ে আলাদা গহনা পরালে তবেই না সবাই তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে।

এই কথায় অবশ্য মানহা খুশি হয়েছে। তারপরেই সে ঠিক করেছে, পুঁতির গহনা পরিয়েই সে পুতুলকে বিয়ে দেবে।

কিন্তু কাজ কি শুধু এইটুকু? একটা বিয়ে বলে কথা,

আরো কত্ত কাজ! মানহা সেই বার যে বিয়ের দাওয়াতে গিয়েছিল বাবা, মা মণি আর আপুর সাথে, সেখানে সে দেখেছে যে বিয়েতে অনেক কাজ। সেইসাথে অনেক আনন্দও। বিয়েতে অনেক রান্না করতে হয়- পোলাও, রোস্ট, জর্দা- কত্ত কী! সাথে কতরকম মিষ্টি থাকে, পান থাকে। কত অতিথি আসে বিয়েতে! সবাই সুন্দর সুন্দর উপহার নিয়ে আসে।

এই সবকিছু দেখে মানহা ঠিক করেছে তার পুতুলকে বিয়ে দেবে। বললেই তো আর বিয়ে হয় না। বর খুঁজতে হবে তো। পাশের বাসার রাইসার একটা ছেলে পুতুল আছে। দেখতেও বেশ সুন্দর। মানহা তার পুতুলের বিয়ে দেবে শুনে রাইসা বলল, বিয়েটা তার পুতুলের সাথেই দিতে। মানহাও রাজি হয়ে গেল। ব্যাস! ঠিক হয়ে গেল পুতুলের বিয়ে। তারপর তারা মিলে দিনক্ষণ ঠিক করল। মানহা রঙিন কাগজ দিয়ে বিয়ের কার্ড বানায়। সেই কার্ড সে সবাইকে দিলো- বাবা, মা মণি, আপু, তার বন্ধুরা- সবাই পেল কার্ড। মানহা সবাইকে বলে দেয়, বিয়েতে কিন্তু আসতেই হবে।

সবকিছু গোছগাছের পর আজকে মানহার পুতুলের বিয়ে হচ্ছে। গতকাল অবশ্য ছোট্ট করে গায়ে হলুদও হয়েছে। বাগান থেকে গাঁদা ফুল এনে সেটা দিয়ে মালা গেঁথে পুতুলকে পরিয়েছিল মানহা। আপু তার হলুদ ওড়নাটা শাড়ির মতো করে পুতুলের গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিল। আপু গান গেয়েছে, মা মণি সেমাই রেঁধে দিয়েছে। ঘরোয়া আয়োজনে দারুণ হয়েছে গায়ে হলুদ।

আজ বিয়ের অনুষ্ঠানটা আরো জমকালো। মা মণি পোলাও, রোস্ট আর ফিরনি রাঁধছে। আপু পানের ডালা সাজাচ্ছে। বাবা এক প্যাকেট মিষ্টি কিনে এনেছে। মানহা সকালে ঘুম থেকে উঠেই সুন্দর একটা জামা পরেছে। তারপর সে সবার কাজ তদারকি করছে। সেইসাথে পুতুলকেও সাজাতে হচ্ছে। সাজানোর কাজটা অবশ্য আপু আর সে দুজন মিলে করছে। দুপুর হতেই অতিথিরা আসতে শুরু করবে। মানহার তিনজন বান্ধবী, পাশের বাসার আপুটা আর উপরের বাসার মামাটা। তার আগেই তো সব কাজ শেষ করতে হবে। এরই মধ্যে মানহা তিনবার পাশের বাসায় গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসেছে রাইসার পুতুল কখন আসবে। বরযাত্রী কখন আসবে সেটা তার জানতে হবে যে। কারণ এর আগেই তো পুতুলকে সাজিয়ে ফেলতে হবে।

দেখতে দেখতে দুপুর হয়ে এল। অতিথিরা চলে এল। সবাই পুতুলের জন্য উপহার নিয়ে এসেছে। রাইসাও তার পুতুলকে নিয়ে চলে এল। রাইসা আর তার পুতুলকে বাসার দরজায় ফুল ছিটিয়ে স্বাগত জানানো হলো। মানহা মেয়ের মা হিসেবে মিষ্টি আর শরবত খাওয়ালো। মা মণির রান্না সবাই খুব মজা করে খেল। আপু গান গাইল। সেই গানের সাথে মানহা, রাইসা আর তাদের বান্ধবীরা তালে তালে নাচল। বর পুতুল আর বৌ পুতুলের অনেক ছবি তোলা হলো।

বিকেল হলে রাইসা বলল, এবার বিয়ে শেষ। এখন তবে আমরা বাসায় যাই।

মানহা হেসে বলল, আচ্ছা। তবে কাল আবার এসো। সকাল সকাল চলে এসো, কাল আমরা লুকোচুরি খেলব।

রাইসা মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল। তারপর সে তার পুতুলকে এক হাতে আর মানহার পুতুলকে এক হাতে তুলে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াতেই মানহা অবাক হয়ে বলল, আমার পুতুল নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?

রাইসা আরো অবাক হয়ে বলল, কেন, তুমি জানো না বুঝি? বিয়ে দিলে তো বউকে বরের বাসায় নিয়ে যেতে হয়।

মানহা অবাক হয়ে আপুর দিকে তাকালো। আপু সম্মতি দিয়ে বলল, হ্যাঁ, তাই তো।

মানহা একটু ভাবল। তারপর সে ফিক করে হেসে ফেলল। বলল, আমার পুতুল যাবে না। আমার পুতুল সবার চেয়ে আলাদা ওকে বিয়ে দেবো, কিন্তু দিয়ে দেবো না।

তার কথা শুনে সবাই হেসে ফেলল। মা মণি জিজ্ঞেস করল, তাহলে বিয়ে দেবে কেন?

মানহা বলল, এই যে দেখো মা মণি, বিয়েতে কত্ত আনন্দ হয়। সবাই বেড়াতে আসে, তুমি মজার

মজার খাবার রান্না করো, পুতুল নতুন শাড়ি-গহনা উপহার পায়।

তারপর সে রাইসার হাত থেকে নিজের পুতুলটা নিয়ে বলল, শোনো রাইসা। আমি তোমার পুতুলের সাথে আমার পুতুলের বিয়ে দেবো না। আগামী শুক্রবার আবার আমার পুতুলের বিয়ে। তুমি এসো কিন্তু। আচ্ছা?

রাইসা জিজ্ঞেস করল, কার সাথে বিয়ে?

মানহা বলল, একা একা বিয়ে। আমি আর কারো সাথে বিয়ে দিচ্ছি না আমার পুতুলকে! আমার পুতুল আমার কাছেই থাকবে।

মা মণি জিজ্ঞেস করল, বর ছাড়া বিয়ে হয়?

মানহা বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল, হয় হয়! লাল শাড়ি আর গহনা পরিয়ে পুতুলকে সাজালে, সবাইকে দাওয়াত দিলে আর মজার মজার রান্না করলেই বিয়ে হয়। কে বলেছে বিয়ে দিতে বর লাগে?

আপু চোখ গোলগোল করে বলল, দুইবার বিয়ে?

মানহা বলল, হ্যাঁ। দুইবার বিয়ে হলে দুইবার নতুন শাড়ি-গহনা আর মজার মজার খাবার। দুইবার না, প্রতি শুক্রবারে বিয়ে। তাহলে প্রতি শুক্রবারেই এমন অনেক আনন্দ হবে।

মা মণি হাসতে হাসতে বলল, আর প্রতি শুক্রবারে আমাকে এত্তগুলো রান্না করতে হবে!

আপু বলল, আমাকে নতুন নতুন শাড়ি আর গহনা বানাতে হবে!

বাবা বলল, আমাকে প্রতিবার মিষ্টি আনতে হবে!

মানহা মিষ্টি করে হেসে বলল, আর প্রতিবার অনেক আনন্দ হবে!

সবাই তার কাণ্ড দেখে একসঙ্গে হেসে উঠল। ■

মাইমুনা আক্তার রাফি, তৃতীয় শ্রেণি, অনাথ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম

গল্প

গুমনামা

সায়েরে নাজাবি সায়েম

কিছুদিন ধরে হলুদিয়া প্রাসাদ পুরো ফাঁকা। রিসেপশনিস্ট, আমার পিওন, ক্লিনার কেউই নেই। শুধু আছে আমার পিএস জমিল।

সকাল সকাল জমিল আমাকে বলল, ম্যাম! জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

কার সাথে? জানতে চাইলাম।

আমাদের পাশের শহরে হট্টগোল চলছে। টিকটিকিদের রাজা রনবীর এসেছেন। মনে হয় আমাদের সাহায্য চাইছেন।

আসতে বলো।

রাজা রনবীর এসেই খুব অস্থির ভাবে বলল, আপাজান! হাই-

হ্যালোতে সময় নষ্ট করব না। সোজাসুজি বলছি, আমার সতেরো জন সিপাহি গায়েব।

বলো কী! খুব অবাক হয়ে গেলাম।

আগের মাসে আপনার মেয়ের বিয়েতে এই সতেরো জনকে পাঠিয়েছিলাম। রান্নাঘর বিভাগ থেকে সুস্বাদু গরম গরম খাবারসহ ওরা এসেছিল। আমি ওদের এখানে আসার খবর ঠিকই পেয়েছি। কিন্তু ওরা ফিরে যায়নি।

আমি খুব ভাবনায় পড়লাম। ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছে দেখছি।

রাজা রনবীর বলল, এক মাস অপেক্ষা করলাম। ভাবলাম, বিয়ের আনন্দে হয়ত মেতে আছে ওরা। কিন্তু আজ খবর পেলাম তেলাপোকা রানি হলুদিয়া, মানে আপনার প্রাসাদও নাকি খালি। এমনকি আপনার মেয়ে জামাইও নাকি তিন রাত ধরে গায়েব।

আমার মেয়ের জামাই গায়েব, ইয়ে মানে...

আপাজান! সেই সৈনিকদের পরিবার রাস্তায় নেমেছে। 'টিকটিক বিচার চাই' বলে রাজা স্লোগান দিচ্ছে। (টিকটিক বলতে টিকটিকিদের রাজা 'ঠিকঠিক' বুঝিয়েছে)

যা বুঝলাম, গুমের জন্য রাজাকে দায়ী করছে ওরা। তাই রাজা এসেছে আমার কাছে। আমি, মানে তেলাপোকা রানি হলুদিয়ার সাহায্য চাইছে। কেননা, আমার প্রাসাদে এসেই তো গায়েব হয়েছে টিকটিকি রাজার সতেরো জন টিকটিকি সিপাহি।

আপাজান! বিষয়টা বিবেচনা করবেন প্লিজ।

আমি আজই দেখব ব্যাপারটা। আমার কথায় আশ্বস্ত হয়ে চলে গেল রাজা রনবীর। ডাকলাম আমার পিএসকে। বললাম, জমিল! আর কাউকে তো দেখছি না। চলো, আমি আর তুমি আগে রান্নাঘর বিভাগে ঢু মেরে আসি। সৈনিকদের শেষবার ওখানেই দেখা গেছে।

বেশ লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে গেলাম রান্নাঘর বিভাগে। কী অবস্থা সেখানে! মাছের কাঁটা, বিস্কুটের টুকরো, আর নানা ধ্বংসস্তূপ পার হয়ে ঢুকলাম ভেতরে। জমিল নিজের অজান্তেই ধাক্কা খেলো একটা মাংসের হাড়ের সঙ্গে। সাথে সাথে ঘূর্ণিঝড় ক্যাটরিনার বেগে কে যেন ছুটে এসে আমাদের দুজনকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। ওমা, কী বাতাস! জ্ঞান হারানোর আগে শুধু দেখলাম দুটো চকচকে ধারালো দাঁত। ঠিক যেন হাতির শুঁড়!

জ্ঞান ফিরতেই দেখি আমি সেই নিষিদ্ধ এলাকায় আছি, যেখানে আসতে বার বার মানা করতেন আমার গুরুজনেরা। বিদঘুটে গন্ধ, চারিদিকে বালি, মাছের কাঁটা, আমার পরিচিত কিছু ইঁদুর ভাইয়ের মাথা এবং গুনে গুনে ঠিক সতেরোটি টিকটিকির মমি হয়ে যাওয়া ক্ষতবিক্ষত শরীর। আমার তেলতেলে শরীর ভিজে গেল আমারই চোখের পানিতে।

ধাম!

বিকট শব্দ হলো।

আমি মরে পড়ে থাকার ভান করলাম।

একটু পর চোখের কোনা দিয়ে দেখতে পেলাম, ধবধবে সাদা সেই দানোকে। গল্পে শুনেছি এর কথা। মিশরের ভয়ংকর বেড়াল দেবতা ফিনিস-এর বংশধর। নাম যারমিনারভা। ওর হাতের থাবার ভেতরে কে? এ যে আমার জমিল! এতিম ছেলেটা বাবা-মাকে হারিয়েছে এই রাক্ষসের হাতে। ওর ও কি তবে একই পরিণতি হবে?

জমিল শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। ওর দুটি পা আমার মুখের সামনে ছিটকে এসে পড়ল। ডানা বাতাসে উড়ছে।

দুটি তীক্ষ্ণ জ্বলজ্বলে সবুজ চোখ এবার আমার দিকে তাকালো। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। সেই তোড়ে আমি উড়ে যাচ্ছিলাম।

কিন্তু সে আমাকে উড়তে দিলো না। ■

গল্প

বুলবুলি ও দুটো ছানা

রকিয়া জান্নাত রুমা

এক গাছে এক বাসা ছিল। সেই গাছে বুলবুল ও বুলবুলি পাখি বাস করত। সুন্দরভাবে তাদের সংসার চলছিল। একদিন দুপুরবেলা খাবারের খোঁজে বের হয় বুলবুল পাখি। ফিরে এসে দেখে সবকিছু এলোমেলো ও এবড়োথেবড়ো এদিকে বুলবুলি পাখি ঘুমিয়ে আছে। তা দেখে বুলবুল

পাখি রেগে আগুন হয়ে যায়। খুব শোরগোল করতে থাকে, বুলবুলি পাখির ঘুম ভেঙে যায়। চোখ খুলতেই সে অবাক হয়ে চেয়ে রয়! পাতায় রাখা খাবারগুলো এমন কে করল? খুব বকাঝকা করে বুলবুল পাখি। বুঝতেই চায় না যে এটা বুলবুলির কাজ নয়। এখানে কিছু ঘটেছিল! পরে বুলবুলি পাখি বিষয়টা অনুসন্ধান করে দেখে যে, নিচ থেকে দস্যি ছেলেরা ঢিল মেরে বাসা ভাঙতে চেষ্টা করেছিল। ভাঙতে পারেনি, শুধু ঢিলের হালকা আঘাত লেগেছে। আর খাবারগুলো এভাবে এবড়োখেবড়ো হয়ে গেছে। বুলবুলি পাখি ঘটনাটি পরে বুঝতে পারে। কিন্তু ভয়ে বুলবুল পাখিকে সব খুলে বলেনি। ঠিকই কিছুক্ষণ পর তারা লক্ষ্য করে কেউ ঢিল ছুঁড়ছে।

বুলবুল ও বুলবুলি পাখি খুবই কষ্ট পেল। কী অপরাধ করেছি? আমাদের বাসা ভেঙে দিতে চায়। আকাশের দিকে দুজনে চেয়ে থাকে আর আকাশের মালিককে সবকিছু বলে। বুলবুল ও বুলবুলি পাখি সেখান থেকে দূরে চলে যায়। নবগ্রামে। সেখানে কাঁঠাল গাছে বাসা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়। এদিকে বুলবুলি পাখির ডিম পাড়ার সময় হয়ে আসছে। দুজনে খুব কষ্ট করে খড়কুটো ও গাছের পাতা দিয়ে নতুন করে বাসা তৈরি করে। পরের দিন সকালে বুলবুলি পাখি দুটি ডিম পাড়ে। কয়েকদিন পর ডিম থেকে ফুটফুটে দুটো বাচ্চা বের হয়। তা দেখে বুলবুল ও বুলবুলি পাখি আনন্দে নেচে উঠে। চারদিকে আগমনি বার্তার প্রেরণার সুর বাজে। আশপাশের সকলকে মিষ্টিমুখ করায়। অনেক পাখি দেখতে আসে, অনেকে অনেক কিছু নিয়ে আসে। ছোট্ট দুটো ছানা আড়ালে রাখে।

কেউ এলে কিচিরমিচির শুরু করে দেয়।

কারো কোলে থাকতে চায় না, শুধু কিচিরমিচির করে, মায়ের কোল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কোল। যে কোল জুড়ে রয়েছে মায়া ও মমতার গভীরতা। ছানা দুটো বড়ো হলো। একটু উড়তে শিখেছে, কিন্তু বেশিক্ষণ উড়তে পারে না, পড়ে যায়। বুলবুল ও বুলবুলি পাখির অনেক বড়ো স্বপ্ন ছোট্ট দুটো ফুটফুটে সুন্দর ছানাদের নিয়ে।

হঠাৎ একদিন সকালে লক্ষ করে কাঁঠাল গাছ বেয়ে এক হুলোবিড়াল উঠছে। তাকে দেখে বুলবুল ও বুলবুলি পাখি ভয়ে অর্ধেক হয়ে যায়। হুলোবিড়ালটি ডাল পর্যন্ত আসে আর উপরে উঠে না, শুধু চোখে চোখে তাকায়। বুলবুল ও বুলবুলি পাখি খুব ভাবনায় পড়ে গেল, এতদিন মানুষ আমাদের ক্ষতি করল। এখন আবার সমস্যা প্রাণীদের সব জায়গাতেই সমস্যা। জোর যার মুল্লুক তার, আজ আমরা দুর্বল বলে বার বার আক্রমণের শিকার হচ্ছি, কিন্তু এভাবেই কি এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় বাসা করা, এটাই কি সমাধান? মনে মনে বুলবুল পাখি ভাবছে আর আফসোস করছে! কোনো হিসেব মেলাতে পারছে না।

বুলবুল ও বুলবুলি পাখি সতর্ক হয়ে থাকে। প্রায়ই হুলোবিড়ালটি ডাল পর্যন্ত আসে উপরে আসে না। এভাবেই দুইদিন পার হয়ে গেল। ঘরে খাবার নেই। খাবারের সন্ধানে বের হবে। হুলোবিড়ালের ভয়ে বেরও হতে পারছে না। পেটের ক্ষুধা অসহনীয়, বের না হলে কী খাবে? দুজনকেই যেতে হবে। অবশিষ্ট কিচ্ছু নেই।

পরিপাটি ঘরটি বন্ধ করে দুজনে খাবার আহরণে বের হয়। দুপুর হয়ে এলো ফিরে আসার নামকথা নেই। ক্ষুধার্ত ছানা দুটো ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে দরজা খুলে বের হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে এ ডাল হতে ও ডাল যায়। নিচু ডালে হুলোবিড়ালকে দেখে ছানা দুটো কান্না শুরু করে দেয়। আকাশের অবস্থাও ভালো না, দ্রুত মেঘে ঢেকে যায়। প্রচণ্ড বেগে বাতাস বহে। বাতাসের বেগ সহনীয় ছিল না। মুহূর্তে বাতাস থেমে গেল। টুপটাপ বৃষ্টি পড়ে আকাশটাও পরিষ্কার হয়ে যায়। ঝলমলে রোদের দেখা মিলল। তার কিছুক্ষণ

পরেই বুলবুল ও বুলবুলি পাখি খাবার নিয়ে হাজির। বাসা দেখে খোলা আর নিচের ডালে হুলোবিড়াল। বাসার ভিতর ছানা দুটোকে না পেয়ে উচ্চঃস্বরে কান্না শুরু করে দেয়। বুলবুল ও বুলবুলি পাখি অনেক খোঁজাখুঁজির পর না পেয়ে হুলোবিড়ালকে সন্দেহ করে। হুলোবিড়াল তাদের দুটো ফুটফুটে সুন্দর ছানাকে খেয়ে ফেলেছে। হুলোবিড়াল সাথে সাথে অস্বীকার করে। বুলবুল ও বুলবুলি পাখি বলল, তুমি মিথ্যে কথা বলছ।

হুলোবিড়াল বলল, না না কেন মিথ্যে কথা বলব। আমারা জাতভেদে পৃথক হতে পারি কিন্তু তোমাদের এত বড়ো সর্বনাশ করতে পারি না। সবাই একই রকম হয় না, কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারছে না হুলো বিড়াল বুলবুলিদের।

বুলবুল পাখি বলল, তাহলে তুমি রোজ নিচ ডালে আসো কেন?

হুলোবিড়াল বলল, কী বলব কষ্টের কথা আমার বাচ্চা নেই! ছানা দুটোকে দেখতে আসি, তোমরা থাকো তাই নিচের ডাল পর্যন্তই আসি। আর উপরে আসি না। আমার খুব মায়া হয়। তাদের মুগ্ধকর কিচিরমিচির ডাক আমাকে নিয়ে আসে!

এরই মাঝে ছানা দুটোর চরম ভয়ার্ত কিচিরমিচির কণ্ঠ কানে ভেসে আসে। সাথে সাথেই বুলবুল ও বুলবুলি পাখি এদিক-ওদিক খুঁজতে শুরু করে। এতে হুলোবিড়ালও যোগ দেয়। অবশেষে খুঁজে পায় এক ঝোঁপের নিচে। কিন্তু ছোটো ছানাটির পা ভেঙে গেছে। ছানা দুটোকে উপরে নিয়ে আসা হলো। এরপর সবকিছু খুলে বলল তাদের সাথে কী ঘটেছিল?

এই ঘটনার জন্য বুলবুল ও বুলবুলি পাখি নিজেকে দায়ী করে, হয়ত একজন বাসায় রয়ে গেলে এত বড়ো সর্বনাশ হতো না। আর হুলোবিড়ালের প্রতি বুলবুল ও বুলবুলি পাখির শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেল। ■

সপ্তম শ্রেণি, উত্তরা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গোদাগাড়ী, রাজশাহী

মুশফিকা ফারাহ্, তৃতীয় শ্রেণি, মিশনারী স্কুল, কুমিল্লা

বর্ষায় থাকি সচেতন

মেজবাউল হক

বর্ষা আমাদের জন্য শুধু শীতল পরশই আনে না, সঙ্গে করে নিয়ে আসে নানা রোগ-বালাইও। এ সময়ে শরীর সুস্থ রাখার জন্য থাকতে হবে সচেতন। বর্ষায় তাপমাত্রা উঠা-নামার কারণে নানা ধরনের জীবাণু বংশবিস্তার করে। সংক্রামক ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস খুব সহজে রোগ ছড়ায়। এ সময় বাড়ির বয়স্ক এবং ছোটোদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তাই সচেতনতাই যথেষ্ট। যত্ন ও মনোযোগ দিতে হবে স্বাস্থ্য এবং খাদ্যাভ্যাসে। তাহলেই ভালো থাকবে তুমি ও তোমার পরিবার।

এ সময় নিয়মিত গোসল এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা খুবই জরুরি। কারণ বর্ষায় স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া, গরম আর ঘামে শরীরে ছত্রাক সংক্রমিত হয়। নিয়মিত গোসল না করলে ময়লা আটকে ছত্রাক বেড়ে যায়। গোসলের পর চুলের গোড়া ভালো করে শুকাতে হবে, কানের ভেতর বাহির ভালো করে মুছে নিবে। ভেজা থাকলে কানে ফাংগাস হয়ে চুলকানি দেখা দেয়। এক্ষেত্রে নিজে নিজে কাঠি, কটন বাড বা অন্যকিছু ভুলেও কানের ভিতরে ঢুকাবে না। প্রয়োজনে চুলকিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

বর্ষায় আরামদায়ক সুতি কাপড় পড়বে। ঘেমে গেলে সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন করে নিবে। ছোটো ভাই-বোন থাকলে তাদের কাঁথা, চাদর ধুয়ে ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। তাহলে আর স্যাঁতসেঁতে হবে না। এ সময়ে বৃষ্টিতে ভেজা যাবে না। নিজের শরীর সম্পর্কে তুমিই ভালো জানো। তাই বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই জুতা বা স্যান্ডেল, ব্যাগ, ছাতা, রেইনকোটসহ বৃষ্টির দিনের জিনিসপত্র সংগ্রহে রাখবে।

বর্ষার সময় মিশ্র আবহাওয়ায় খাবারের প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে। এ সময় ডায়রিয়ার প্রকোপ বেড়ে যায়। সে কারণে বাইরের ও বাসি খাবার একদমই খাবে না। তেল-মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলবে। আম, লিচু, জামরুল, জাম, কাঁঠাল, আনারসসহ নানারকম মৌসুমি ফল বেশি বেশি খাবে।

বন্ধুরা, এ সময় মশার উপদ্রব অনেক বেড়ে যায়। তাই ডেঙ্গু জ্বরসহ নানা রোগের আশঙ্কাও থাকে। এই ঋতুতে শুধু বাড়ির ভেতরটা নয়, পরিষ্কার রাখতে হবে বাড়ির আশপাশও। ঝোপঝাড় থাকলে তা পরিষ্কার করে মশার ওষুধ ছিটিয়ে দিতে হবে। ঘরের ভেতর খাটের নিচে, আলমারির পেছনসহ বিভিন্ন ফার্নিচারের আটকানো জায়গাগুলো নিয়মিত পরিষ্কার রাখবে। কারণ ঘরের এসব জায়গাতেই মশা লুকিয়ে থাকে। এডিস মশার উপদ্রব কমাতে ফুলদানি, ফুলের টব বা পড়ে থাকা পাত্রে তিন দিনের বেশি যেন পানি আটকে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখবে। রাতে তো বটেই, দুপুরে বা বিকালে ঘুমালে মশারি টানিয়ে ঘুমাবে।

বর্ষাকালে চারদিকে পানি থই থই করে। সেজন্য সাঁতার না জানলে একা একা পানিতে নামবে না। এ সময়ে বাড়ির ছোটোদের প্রতিও বিশেষ নজর রাখবে। যাতে কোনো ভাবে চোখ এড়িয়ে পানিতে পড়ে না যায়। সাঁতার না জেনে দলবেধে বন্ধুদের সাথেও পানিতে নামবে না। কারণ একটু অসাবধানতা অনেক বড়ো বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই এ বিষয়ে বাড়ির ছোটো-বড়ো সবাই সচেতন থাকা জরুরি। ■

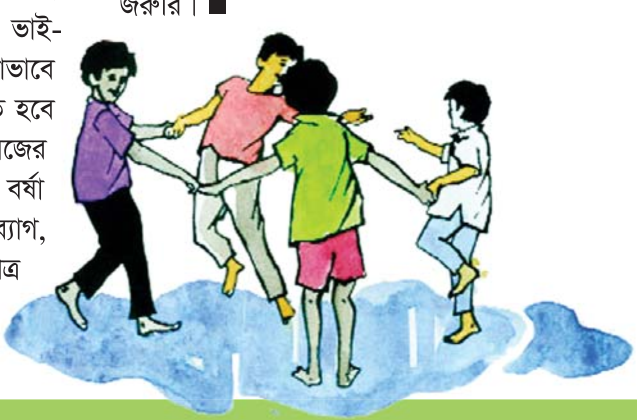

শতবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শাহানা আফরোজ

সব নৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়া জাতির আলোকবর্তিকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ৯৯ বছর পেরিয়ে শত বছরে পদার্পণ করেছে। করোনাভাইরাস মহামারির কারণে স্বল্প পরিসরে ৯৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে স্বাধীন জাতিসত্তার বিকাশের লক্ষ্যে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এটি শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৭১'র মুক্তিযুদ্ধ, ৯০'র গণঅভ্যুত্থানের মতো গুরুত্বপূর্ণ সব ইতিহাস। দেশের যে-কোনো ক্রান্তিলগ্নে অনবদ্য ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজপথ শহিদের তাজা রক্ত লেগে যেমন হয়েছে রঞ্জিত, তেমনি এই পথের ধুলায় লেগে আছে শত রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, জ্ঞানী, গুণীজনের পদচিহ্ন-যাঁরা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বহির্বিশ্বে হয়েছেন সমাদৃত। পুরাতনের প্রস্থান আর নতুনের আগমনে সর্বদা মুখরিত বিশ্ববিদ্যালয় কালের আবর্তনে নতুনরূপে আজো ধরে রেখেছে ঐতিহ্য, পা দিয়েছে শতবর্ষে।'

১৯২১ সালের ১লা জুলাই শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টির দ্বার উন্মুক্ত হয়। সে সময়কার ঢাকার সবচেয়ে অভিজাত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত রমনা এলাকায় প্রায় ৬০০ একর জমির ওপর গড়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এর প্রাথমিক অবকাঠামো ঢাকা কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী এবং কলেজ ভবনের (বর্তমান কার্জন হল) উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। প্রথম শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন বিভাগে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৮৪৭ জন এবং শিক্ষক সংখ্যা ছিল মাত্র ৬০ জন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী লীলা নাগ। তিনি ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন (এমএ-১৯২৩)। ৩টি অনুষদ (কলা, বিজ্ঞান ও আইন), ১২টি বিভাগ, ৬০ জন শিক্ষক, ৮৪৭ জন ছাত্রছাত্রী এবং ৩টি আবাসিক হল নিয়ে এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে।

কলা অনুষদের অধীনে ছিল ৮টি বিভাগ: সংস্কৃত ও বাংলা, ইংরেজি, শিক্ষা, ইতিহাস, আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ, ফার্সি ও উর্দু, দর্শন এবং রাজনৈতিক অর্থনীতি; বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে ছিল পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং গণিত; আইন অনুষদের অধীনে ছিল শুধুমাত্র আইন বিভাগ। ৩টি অনুষদের মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৮৬ জন ঢাকা (শহীদুল্লাহ) হলে, ৩১৩ জন জগন্নাথ হলে এবং ১৭৮ জন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক ও অনাবাসিক শিক্ষার্থী হিসেবে ভর্তি হয়। ঢাকা কলেজ ও জগন্নাথ কলেজের (বর্তমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) ডিগ্রি ক্লাসে অধ্যয়নরত ছাত্রদের নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে। শুধু ছাত্র নয়, শিক্ষক এবং লাইব্রেরির বই ও অন্যান্য উপকরণ দিয়েও এই দুটি কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করে। এই সহযোগিতা দানের কৃতজ্ঞতা হিসেবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি হলের নামকরণ করা হয় ঢাকা হল (বর্তমানে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল) ও জগন্নাথ হল।

দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীরই স্বপ্নের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রাচ্যের এই অক্সফোর্ড। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের বিষয়ে উইকিপিডিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ব্রিটিশ শাসনামলে স্বাধীন জাতিসত্তার বিকাশের লক্ষ্যে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর ঢাকাকে রাজধানী করে নতুন পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলায় শিক্ষার সবচেয়ে উন্নতি ঘটে। কিন্তু ১৯১১ সালের ১লা নভেম্বর দিল্লির দরবারে ঘোষণার মাধ্যমে ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ বাতিল করা হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববঙ্গে শিক্ষার যে জোয়ার এসেছিল, তাতে অচিরেই ঢাকাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অবধারিত ছিল। বঙ্গভঙ্গ বাতিলের ফলে সে সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়।

১৯১২ সালের ২১শে জানুয়ারি ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা সফরে আসেন। এই সফরকালে ঢাকার কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তার সাথে সাক্ষাৎ করে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করেন ১৯১২ সনের মে মাসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যারিস্টার রবার্ট নাথানের নেতৃত্বে নাথান কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির ২৫ টি সাবকমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারত সরকার প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রূপরেখা স্থির করে। ভারত সচিব ১৯১৩ সালে নাথান কমিটির রিপোর্ট অনুমোদন দেন। কিন্তু, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়।

১৯১৭ সালের মার্চ মাসে ইমপেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ির নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সরকারের কাছে অবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল পেশের আহ্ববান জানান। ১৯১৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর লর্ড হার্ডিঞ্জ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাসমূহ তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (স্যাডলার কমিশন) ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। ঢাকা কলেজের আইন বিভাগের সহাধ্যক্ষ ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল শক্তিরূপে অভিহিত করেন। একই কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির অধ্যাপক টি সি উইলিয়ামস অর্থনৈতিক বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ঢাকা শহরের কলেজগুলোর পরিবর্তে বিভিন্ন আবাসিক হলকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিটরূপে গণ্য করার সুপারিশ করে।

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিল হাউসের পাঁচ মাইল ব্যাসার্ধ এলাকাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত এলাকায় গণ্য করার কথাও বলা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তেরোটি সুপারিশ করেছিল এবং কিছু রদবদলসহ তা ১৯২০ সালের ভারতীয় আইন সভায় গৃহীত হয়। ১৯২০ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি ভারতীয় আইনসভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। ওই বছর ১৮ই মার্চ এটি আইনে পরিণত হয়। ১৯২০ সালের ২৩শে মার্চ 'দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট' গভর্নর জেনারেলের অনুমোদন লাভ করে। এ আইনের বলে ১৯২১ সালের ১লা জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

১৯২১ সালের ১লা জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। কমিশনের ১৩টি সুপারিশের প্রায় সবগুলোই ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাক্টে সন্নিবেশিত হয়। স্যাডলার কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক রেজিস্টার স্যার পি. জে. হার্টগ। ভারতের গভর্নর জেনারেল ১৯২০ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করেন। উপাচার্য ডিসেম্বরের ১০ তারিখে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এ পর্যন্ত ২৭ জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কোষাধ্যক্ষ (অবৈতনিক) ছিলেন জে.এইচ লিন্ডসে, আইসিএস (১-৭-১৯২১ থেকে ২০-২-১৯২২), প্রথম রেজিস্ট্রার খানবাহাদুর নাজির উদ্দিন আহমদ (১০-৪-১৯২১ থেকে ৩০-৬-১৯৪৪) এবং প্রথম প্রক্টর ফিদা আলী খান (১৯২৫-১৯৩০)। ১৯৭৬ সাল থেকে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর পদ সৃষ্টি করা হয়। প্রথম প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন ড. মফিজুল্লাহ কবির। এ পর্যন্ত ১৩ জন এ পদে দায়িত্ব পালন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোনো স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ব্রিটিশ ভারতে তৎকালীন শাসকদের অন্যায্য সিদ্ধান্তে পূর্ববঙ্গের মানুষের প্রতিবাদের ফসল হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে একটি সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ রদের রাজকীয় ক্ষতিপূরণ হিসেবে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত 'Truth shall Prevail' স্লোগান লেখা একটি মনোগ্রাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম হিসেবে ব্যবহার করা হতো। পরবর্তী সময়ে এ মনোগ্রাম তিনবার পরিবর্তন করা হয়। প্রথম মনোগ্রামে আরবিতে 'ইকরা বিস্মে রাব্বিকাল্লাজি খালাক্ব' (১৯৫২-৭২), দ্বিতীয় মনোগ্রামে 'শিক্ষাই আলো' (১৯৭২-৭৩) এবং 'শিক্ষাই আলো' লেখা সংবলিত নতুন ডিজাইনের তৃতীয় মনোগ্রাম অদ্যাবধি ব্যবহার করা হচ্ছে। ■

প্রকৃতি

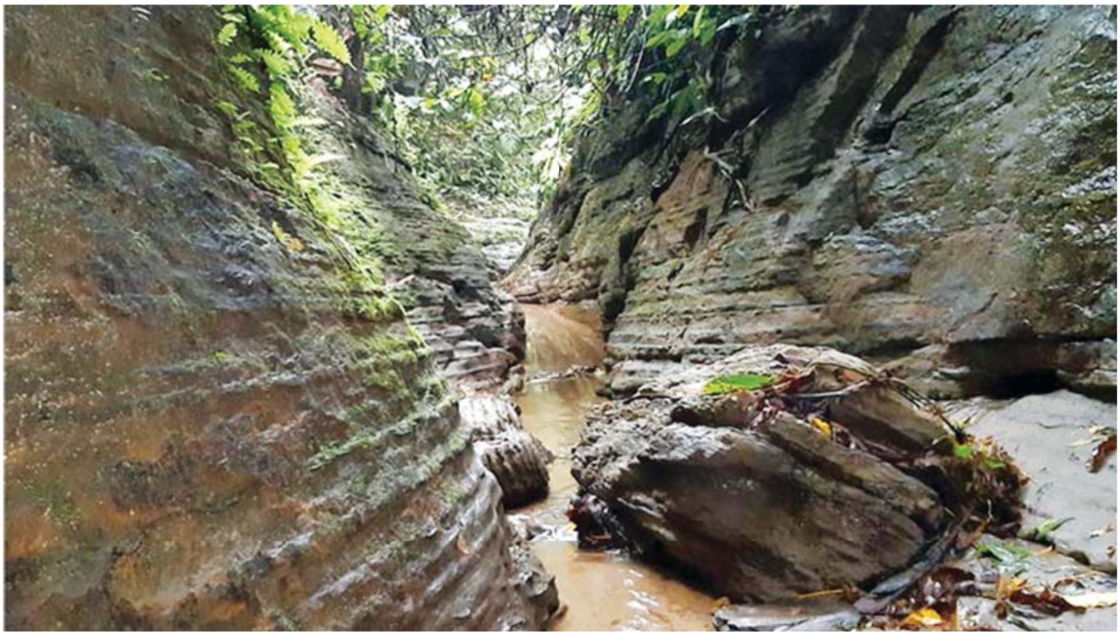

আমাদের গিরিখাত

নুরুল ইসলাম বাবুল

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ঘর হতে শুধু দু পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের ওপরে একটি শিশির বিন্দু

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা ঘুরে বেড়াতে নিশ্চয়ই ভালোবাসো। ঘুড়ে বেড়ানোর তালিকায় নিজের দেশকে আগে রাখবে। আমাদের দেশটা অনেক সুন্দর। আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে সুন্দর সুন্দর স্পট। ইতিমধ্যেই অনেক জায়গা তোমাদের দেখা হয়ে গেছে। আবার নতুন নতুন জায়গায় যাবে। এমনই একটি নতুন জায়গার সাথে আজ তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেবো–

সম্প্রতি বাংলাদেশের মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় তিনটি প্রাচীন সরু গিরিখাতের সন্ধান পাওয়া গেছে। কয়েক হাজার বছরের পুরনো এই গিরিখাতের সাথে একই পাহাড়ে কয়েকটি ছোটো ছোটো ঝরণাও রয়েছে। এসব অপরূপ গিরিখাত এবং ঝরণা বিশ্বের অন্যান্য গিরিখাতের মতোই আকর্ষণীয় ও রোমাঞ্চকর। মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার সিন্দুরখার ইউনিয়নের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় এসব গিরিখাতের সন্ধান মিলেছে।

ঢাকা থেকে প্রায় ২১৫ কিলোমিটার, মৌলভীবাজার জেলা শহর থেকে ৪৫ কিলোমিটার ও শ্রীমঙ্গল উপজেলা শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে গিরি খাতগুলোর অবস্থান। প্রতিবেশী দেশ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলার সিন্দুরখান ইউনিয়নের ঘন জঙ্গলবেষ্টিত পাহাড়ি এলাকা এটি। প্রথমে জিপ বা মোটরসাইকেল নিয়ে যেতে হয়। এরপর হেঁটে যেতে হয় কয়েক কিলোমিটার। এলাকাটি গাছগাছালিতে ভরা। এর আশপাশে অধিকাংশ পাহাড়ি ছড়া আর খাড়া পাহাড়।

পুরো অঞ্চলটি পড়েছে সেখানকার খাসিয়া পল্লির ভেতর। আদিবাসী খাসিয়া জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা এটি। খাসিয়া ভাষায় এলাকাটিকে ‘লাসুবন বা পাহাড়ি ফুল’ নামে ডাকা হয়। জনশ্রুতি আছে

যে, কয়েক হাজার বছর ধরে অব্যাহতভাবে জলধারা প্রবাহিত হতে হতে গিরিখাতগুলোর দু'পাশ খাড়া পাথরে পরিণত হয়েছে। এই পানির ক্রমাগত ধারায় পাহাড়ের গায়ে সৃষ্টি হয় মনমাতানো কারুকাজ যা দেখতে বিশ্বের অন্যান্য গিরিখাতের মতো। সদ্য আবিষ্কৃত এই গিরিখাতগুলো দেখতে বেশ রোমাঞ্চকর হলেও যাতায়াতের পথ বন্ধুর এবং ঝুঁকিপূর্ণ।

পাহাড়ি ছড়া লাংলিয়াছড়া ধরেই পুরো এলাকাটি ঘুরে আসা যায়। এটি ভারতের ত্রিপুরা থেকে নেমে এসেছে। প্রায় ২৫ কিলোমিটার পথ বেয়ে মিশেছে শ্রীমঙ্গলের বিলাস ছড়ায়। আঁকাবাঁকা ছড়ায় মিশে রয়েছে শ' খানেক ছোটোবড়ো পাথরের ছড়া। দিন রাত ঝিরিঝিরি শব্দে অবিরাম জল গড়িয়ে পড়ছে। স্থানীয় খাসিয়া ভাষায় 'ক্রেম ক্লু, ক্রেম কেরি ও ক্রেম উল্কা' নামে বড়ো তিনটি গিরিখাত পর্যটকদের মূল আকর্ষণ। এসব গিরিখাত কোথাও বড়ো আবার কোথাও সরু।

স্থানীয়রা জানালেন, পুরো এলাকায় আছে ছোটো-বড়ো অর্ধশত ছোটো ঝিরিধারা। পাহাড় বেয়ে নেমে আসা এসব ঝিরির সবচেয়ে বড়োটিকে স্থানীয়রা 'ডিবারমিন' ঝরণা বলে থাকেন।

নাহার খাসিপুঞ্জীর প্রধান বলেন, জায়গাটি আমরা যত্নে রেখেছি প্রাকৃতিক পরিবেশের কোনো ক্ষতি হতে দেইনি। এখানে পর্যটন উন্নয়ন হোক তাতে আমাদের সমস্যা হবে না, তবে পরিবেশের বিয়ষটি সবার আগে গুরুত্ব দিতে হবে।

সীমান্তবর্তী এই স্থানে এখনো স্বাভাবিক চলাচলের মতো রাস্তাঘাট তেমন গড়ে ওঠেনি। তাই কেউ যাতে ঝুঁকি নিয়ে আপাতত সেখানে যেন না যায় সেই পরামর্শ দিয়েছে পরিবেশবিদরা। রাস্তাঘাট নির্মাণসহ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পরই পর্যটকদের প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। ■

আনিসা চৌধুরী, জুনিয়র টু, ম্যাপল লীফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা

গল্প

এক যে ছিল রাজা

নাসিম সুলতানা

রাজা বীরচন্দ্র। আর রানি মধুলতা। তাদের একমাত্র রাজকুমারের নাম ফুলকুমার। রাজ্য জুড়ে ছিল সুখ। চাষি মনের সুখে চাষ করে। তাঁতি কাপড় বোনে। মাঝি গান গেয়ে নৌকা বায়। রাখাল বাঁশি বাজিয়ে গরু চরায় মাঠে। রাজ্যে কোনো অভাব নেই। তবু রাজার মনে অনেক দুঃখ।

সবাই মনের সুখে খেয়ে দেয়ে শান্তিতে আছে। কিন্তু একটা জিনিসের তাদের খুব অভাব। আর সেটা হলো শিক্ষার।

রাজা নিজেও লেখাপড়া জানে না। গ্রামেও কোনো শিক্ষিত লোক নেই। আর থাকবেই বা কেমন করে। কারণ গ্রামে কোনো স্কুল বা পাঠশালা নেই। যেখানে যেয়ে তারা বিদ্যা-শিক্ষা অর্জন করবে। ফুলকুমার একটু বড়ো হলো। রাজা চায় সে লেখাপড়া শিখুক। লেখাপড়া না শিখলে ভালো রাজা হওয়া যাবে না। তিনি অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করলেন রাজকুমারকে অনেক দূরের রাজ্য সবুজনগরে পাঠাবেন। সে দেশের চারদিকে শুধু সবুজ গাছপালা। আছে নাম করা বিদ্বানরা। দেশের কেউ অশিক্ষিত নন। আছে বিদ্যালয়। সবাইকে বাধ্যতামূলক লেখাপড়া করতে হয়। রাজা বীরচন্দ্র রাজকুমারকে সেই সবুজ নগরে পাঠালেন নামকরা শিক্ষাগুরু বিদ্যালঙ্করের কাছে বিদ্যা শিখতে। গুরু বিদ্যালঙ্করের কাছে লেখাপড়ায় ফাঁকি দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। শুধু লেখা আর পড়া। এভাবে পড়তে পড়তে ফুলকুমার অনেক বিদ্যা অর্জন করল।

লেখাপড়া শিখতে শিখতে এদিকে বড়ো হয়ে গেল ফুলকুমার। অনেক বিদ্যা শিখে এখন জ্ঞানী হয়েছে।

একদিন গুরু বিদ্যালঙ্কর ফুলকুমারকে সাথে নিয়ে রাজা বীরচন্দ্রের কাছে আসলেন। ফুলকুমার এখন যুবক হয়ে গেছে। পড়তে পড়তে প্রায় দুই যুগ পার হয়ে গেল। এদিকে রাজা ও রানি বৃদ্ধ হয়ে গেছে। অনেকদিন পর রাজকুমারকে দেখে তারা আনন্দে কেঁদে ফেলল। তাদের রাজকুমার লেখাপড়া শেষ করে বিদ্বান হয়ে দেশে ফিরেছে।

শিক্ষগুরু বিদ্যালঙ্করকে রাজা পাশে বসালেন। যুবরাজ ফুলকুমারকে দেখে রাজ্যের প্রজারা খুব খুশি। পরদিন রাজসভা বসেছে। রাজার একপাশে শিক্ষাগুরু বিদ্যালঙ্কর আর অন্যপাশে যুবরাজ ফুলকুমার। সামনে প্রজারা অধীর আগ্রহে বসে আছে যুবরাজের কথা শোনার জন্য। তাদের সেই ছোট্ট রাজকুমার আজ অনেক বড়ো বিদ্বান হয়েছে।

প্রথমে শিক্ষাগুরু বিদ্যালঙ্কর বললেন— শোনেন রাজামশাই, মূর্খ রাজার চেয়ে বিদ্বান ভিক্ষুকও অনেক ভালো। রাজা নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নাম তো আপনি শুনেছেন। তিনি কি বলতো জানেন— একটি শিক্ষিত জাতি পেতে হলে, একটি শিক্ষিত মা দরকার। আর এই শিক্ষিত মা পেতে হলে শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

যুবরাজ ফুলকুমার দাঁড়িয়ে প্রজাদের কুশলাদি জানতে চাইলেন। প্রজারা হাত নাড়িয়ে যুবরাজকে অভিনন্দন জানালো। রাজা যুবরাজ ফুলকুমারকে রাজ্যের দায়িত্ব দিতে চান, এই বলে তিনি ফুলকুমারকে রাজা ঘোষণা করলেন। যুবরাজ ফুলকুমার তার উপর অর্পিত দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করার অঙ্গীকার করলেন এবং প্রথম কাজ হিসেবে গ্রামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করার কথা ঘোষণা দিলেন। সবশেষে বিদ্যালস্কারকে স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিলেন। রাজ্যময় খুশির জোয়ার। তাদের গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা হবে। তারা সবাই লেখাপড়া করতে পারবে। প্রজারা মনে করল লেখাপড়া ছাড়া কোনো ভালো কিছু শেখা যাবে না। এখন থেকে স্কুলে যেতে হবে। একটি শিক্ষিত জাতি পেতে হলে ছেলে-মেয়ে সবাইকে লেখাপড়া শিখতে হবে। ■

বিশ্ব রসিকতা দিবস

প্রসেনজিৎ কুমার দে

নবারুণ বন্ধুরা, রসিকতা বা কৌতুক বিষয়টি তোমরা জানো। অর্থাৎ হাসিঠাট্টা। এটা একটি সর্বজনীন স্বীকৃত অভিব্যক্তি। রসিকতা হলো কোনো বক্তব্য, উচ্চারণ বা অঙ্গভঙ্গি যা মানুষের মনে হাস্যরসের সঞ্চার করে, মানুষকে হাসায়। প্রতি বছর ১লা জুলাই বিশ্ব রসিকতা দিবস (ইন্টারন্যাশনাল জোক ডে) হিসেবে পালন করা হয়। এ দিনে বন্ধু বা প্রিয়জনদের নিয়ে হাসিময় একটা দিন কাটানো যায়।

বিশ্ব রসিকতা দিবস কোথায়, কীভাবে উদ্ভব হয়েছে তার সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে ধারণা করা হয়, রসিকতা বিষয়টি শত শত বছর ধরে চলে আসছে। কথিত আছে, ৩৫০ খ্রিষ্টপূর্ব সময়কালে প্রাচীন গ্রিসে রসিকতার জন্য একটা কমেডি ক্লাব খোলা হয়েছিল। এই কমেডি ক্লাবে প্রধানত একে অপরের সাথে কৌতুক, হাসিঠাট্টা মূলক ধাঁধা বিনিময় এবং তামাশা করা হতো। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে রসিকতা দিবসের প্রচলন শুরু হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। প্রাচীন গ্রিসের একটি জনপ্রিয় কৌতুক প্রচলিত ছিল। কৌতুকটি হচ্ছে–

একদা একজন নাপিত, একজন টাকওয়ালা এবং একজন আনমনা প্রফেসর একসঙ্গে রাতে এক যাত্রা শুরু করে। যাত্রা শিবিরে সারারাত তাদের ভ্রমণের মালপত্র পাহারার জন্য তারা তিনজন সময় ভাগাভাগি করে নেয়। যখন নাপিতের সময় আসে তখন নাপিত বসে বসে বিরক্ত হচ্ছিল। তাই সে ঘুমিয়ে থাকা আনমনা প্রফেসরের মাথা নেড়া করে দেয়। এরপর যখন প্রফেসরের পাহারা দেওয়ার সময় আসে তখন নাপিত তাকে ডেকে দেয়। প্রফেসর তখন উঠে অনুভব করে তার মাথার চুল নেই, সে টাক। তখন প্রফেসর বলে, ‘নাপিতটা কতটা নির্বোধ যে সে আমার পরিবর্তে টাকওয়ালাকে ডেকে তুলেছে। কি বন্ধুরা, অনেক মজার না?

একটা মানুষ যত হাসবে ততই তার মন প্রফুল্ল থাকবে, স্নায়ু থাকবে সতেজ। আমাদের সকল সমস্যা আর দুশ্চিন্তা এই হাসিঠাট্টা বা রসিকতা দিয়ে ভুলে থাকতে পারি। চিকিৎসা বিজ্ঞানে বলা হয়, হাসিঠাট্টা বা রসিকতার মাঝে থাকা মানুষগুলোর হার্ট সুস্থ থাকে। তাছাড়া রসিকতা মানুষের ইমিউনিটি সিস্টেম অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সচল রাখতে সহায়তা করে। রসিকতা পারে মানসিক চাপ কমিয়ে ইমিউনিটি সিস্টেমকে আরো শক্তিশালী করতে। এছাড়াও হাসিঠাট্টা মনকে নিয়ে ইতিবাচক ভাবতে সাহায্য করে। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন হাসি ক্যালরি বার্ন করে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। রসিকতা দিবস নানাভাবে উপভোগ করা যেতে পারে। ইচ্ছে করলে এ দিনে তোমরা ছোটো ছোটো কৌতুক তোমাদের বন্ধু বা আত্মীয়দের মেসেজ করতে পারো অথবা মুখ দিয়ে বলে হাসাতে পারো। এছাড়া বন্ধুমহলে এ দিনে সারপ্রাইজ একটা ছোটোখাটো পার্টি আয়োজন করেও দিনটিকে দারুণভাবে উপভোগ করা যেতে পারে। ■

জেনে নেই মজার কিছু তথ্য

শাহনাজ সুলতানা

ছোটবন্ধুরা, আমরা প্রতিনিয়তই নতুন নতুন অনেক কিছুর সাথে পরিচিত হচ্ছি। অনেক কিছু শিখছি। এরমধ্যে অনেক মজার তথ্য আমাদের অজানা থেকে যাচ্ছে। তেমনি কিছু তুলে ধরলাম তোমাদের জন্য-

- অক্টোপাসের দেহে তিনটি হৃৎপিণ্ড আছে
- আপেল খেতে যত স্বাদ লাগুক না কেন, আপেলে রয়েছে ৮৪ ভাগ পানি
- যিনি এখনি কলা খেল তার প্রতি মশার আকর্ষণ বেশি
- এক কাপ কফিতে ১০০-এর বেশি রাসায়নিক পদার্থ আছে
- এক ঘণ্টা চুইংগাম চিবালে ৩০ ক্যালরি তাপ ক্ষয় হয়
- গরুকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠানো যায়, কিন্তু নিচে নামানো যায় না
- চিংড়ি শুধু পিছনের দিকে সাঁতার দিতে পারে
- চোখ খোলা রেখে ব্যাঙ কখনো কিছু গিলতে পারে না
- জলহস্তী পানির নিচে ৩০ মিনিট দম বন্ধ করে থাকতে পারে
- চাঁদ যখন সরাসরি মাথার উপর থাকে, তখন তোমার ওজন সবচেয়ে কম
- ডলফিন চোখ বন্ধ করে ঘুমায়
- মানুষের মতোই শিম্পাঞ্জিও হ্যান্ডশেক করে ভাব বিনিময় করে
- এক পাউন্ড বিশুদ্ধ তুলা থেকে ৩৩ হাজার মাইল লম্বা সুতা তৈরি সম্ভব
- পিঁপড়ার ঘ্রাণশক্তি কুকুরের চেয়েও বেশি
- পেঙ্গুইন একমাত্র পাখি যে সাঁতার কাটতে পারে কিন্তু উড়তে পারে না
- প্রজাপতির চোখের সংখ্যা ১২ হাজার
- ফড়িংয়ের কান মলে দিতে চাইলেও কিন্তু পারবে না কারণ ফড়িংয়ের কান হাঁটুতে থাকে
- মৌমাছির চোখ ৫টি
- মশার দাঁত ৪৭টি
- আমাদের মতো মাছেরও কাশি হয়
- শরীরের পিছন থেকে নিশ্বাস নেয় কচ্ছপ
- হাতি একমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণী, যারা লাফ দিতে পারে না
- আমাদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে চোখের রং হালকা হয়ে যায়
- একজন মানুষের চোখ গড়ে ৪২ লাখ বার পলক ফেলে
- হাতের নখ, পায়ের নখের থেকে চারগুণ দ্রুত বাড়ে
- মানবদেহে মোট হাড়ের চার ভাগের ১ ভাগ পায়ে থাকে
- বন্ধুরা, তুমি ইচ্ছা করে চোখ খুলে কখনোই হাঁচি দিতে পারবে না। বিশ্বাস না হলে এক্ষুনি চেষ্টা করে দেখো
- তুমি চেষ্টা করলেও কখনো নিজের কনুই কামড় দিতে পারবে না। চেষ্টা করে দেখ তো বন্ধুরা। ■

স্থূলতায় করণীয়

মো. জামাল উদ্দিন

মোটা হলে শরীরে রোগ বাসা বাঁধে। বাসাটা যে মানুষ বড়ো হলেই বাঁধে তা কিন্তু নয়, অল্প বয়সি শিশুরাও আজকাল শুধু মোটা হওয়ার কারণে একটু একটু করে এগিয়ে যায় জটিল রোগে আক্রান্ত জীবনের দিকে। করোনাকালীন মহামারির এই দিনগুলোতে তোমাদের স্কুল-কলেজ বন্ধ, খেলাধুলা করারও সুযোগ নেই। সবসময় ঘরে থাকার কারণে তোমাদের অনেকের শরীর মোটা হয়ে যাচ্ছে। এই মুটিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার সমাধান ও কিছু সাধারণ টিপস। তোমাদের জন্য-

- পুষ্টিবিদের পরামর্শ অনুযায়ী একটি ফিটনেস রুটিন এবং ডায়েট চার্ট মেনটেইন করো
- নিজেরাই ক্যালরি কাউন্ট করার চেষ্টা করো। অর্থাৎ পুষ্টিবিদের ডায়েট চার্টের বাইরে কখন এবং কী বাড়তি খাবার খেয়ে ফেলেছ তার চার্ট রাখো, যা তোমার মেডিটেশন বাড়াতে সাহায্য করবে
- ব্যায়াম এর মাধ্যমে কতটুকু ক্যালরি ক্ষয় করছে আর কতটুকু ক্যালরি শরীরে ঢুকছে তার একটি তুলনামূলক হিসাব রেখো
- প্রতি সপ্তাহে ১দিন অথবা মাসে ২দিন ওজন কমানোর খাদ্য তালিকা না মেনে স্বাভাবিক খাদ্য তালিকা মেনে চলো। এতে সপ্তাহের বাকি দিনগুলো সহজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে
- ঘুম থেকে উঠে বিছানায় শুয়েই কিছু হালকা ব্যায়াম করো
- চেষ্টা করো প্রতি সপ্তাহে অন্তত ১০ মিনিট করে ব্যায়ামের সময় বাড়াতে
- ব্যায়াম করার সময় একজন উৎসাহী সঙ্গী সাথে নাও
- রাতের খাবারের অন্তত ২ ঘণ্টা পর ঘুমাতে যাও এবং চেষ্টা করো সেসময় কিছু হাঁটাহাঁটি করতে
- দিনে অন্তত ২-৩ লিটার পানি পান করো
- দৈনিক খাদ্য তালিকার বাইরে হঠাৎ কখনো খিদে পেলে সালাদ বা ফল জাতীয় খাবার খেতে পারো
- সবাই ঘরে থাকো, সুস্থ থাকো।

ডিজিটাল রঙিন ঘুড়ি আকাশে

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

বন্ধুরা, করোনার এই সময়ে এখন একঘেয়েমি বন্দি জীবন তাই না। এই বন্দি জীবনকে সকলেই উপভোগ করছো নানারকম বিনোদনের মাধ্যমে। এর মধ্যে বিকেল হলেই ছাদে ছাদে ঘুড়ি ওড়ানো বিনোদনটি এখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। নীল আকাশে দেখা মিলে নানা রং-বেরঙের ঘুড়ি। ঠিক এই সময়ে 'ডিজিটাল রঙিন ঘুড়ি উৎসব' -এর আয়োজনে মেতে উঠেছে নেত্রকোনার ঘুড়ি প্রেমীরা। করোনা ভয় উপেক্ষা করে নানা বয়সের ঘুড়ি প্রেমীরা মেতে উঠেছে এ উৎসবে। নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ সবাই যোগ দিচ্ছে ডিজিটাল ঘুড়ি উৎসবে।

ডিজিটাল ঘুড়ি আবার কী? বন্ধুরা, ডিজিটাল ঘুড়ি সাধারণ ঘুড়ির মতোই আকাশে ওড়ে। এই ঘুড়ি রাতের আকাশে বেশি সুন্দর লাগে। কারণ জ্বলজ্বলে

এই ঘুড়িটির রাতের আকাশে অবাধ বিচরণ সকলকে মুগ্ধ করে তোলে। মূলত বাঁশের চটি, শক্ত সুতা আর প্লাস্টিকের ছাউনি দিয়ে এই ঘুড়ি তৈরি করা হয়। মোবাইলের ব্যাটারির সঙ্গে চিকন ইলেকট্রিক তার লাগানো হয়। এরপর ঘুড়ির চারপাশে ছোটো ছোটো মরিচ বাতি বা ফোকাস লাইট লাগানো হয়। ফলে রাতের আকাশে ঘুড়িগুলো যখন ওড়ে তখন দেখতে উজ্জ্বল তারার মতো মনে হয়।

সীমান্তবর্তী জেলা নেত্রকোনায় এখন যেন আকাশের নিচে আরেক আকাশ। সেখানে সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত এক মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। এই ডিজিটাল ঘুড়ির উদ্ভাবক নেত্রকোনা সদর উপজেলার গদাইকান্দি গ্রামের চা বিক্রেতা শান্ত মিয়া। করোনা মোকাবিলায় লকডাউন চলাকালে তিনি ছেলেকে ঘরে রাখতে নিজ হাতে বানিয়ে দেন এই ঘুড়ি। এত সুন্দর ঘুড়ি দেখে আশপাশের সকলেই আবদার করে বানিয়ে দেওয়ার জন্য। শান্ত মিয়া সকলকেই অসংখ্য ঘুড়ি বানিয়ে দেন। দেখতে দেখতে এখন গ্রাম ও শহরের সকলে প্রতিযোগিতা করে ডিজিটাল ঘুড়ি বানাচ্ছে। হয়েছে আয়ের এক অন্যতম উৎসও।

৪০০-৫০০ টাকা খরচের মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে এই ঘুড়ি। আকর্ষণীয় করে তুলতে খরচ হয় দুই হাজার টাকা পর্যন্ত। মজার ব্যাপার হলো, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ খবর জেনেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ। তাই ঘুড়ি বিক্রির অর্ডার আসছে বিভিন্ন জেলা থেকে। বন্ধুরা তোমরাও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে কিনতে পারো ডিজিটাল রঙিন ঘুড়ি। আর আলোয় আলোয় বর্ণিল করে দাও রাতের আকাশ। ■

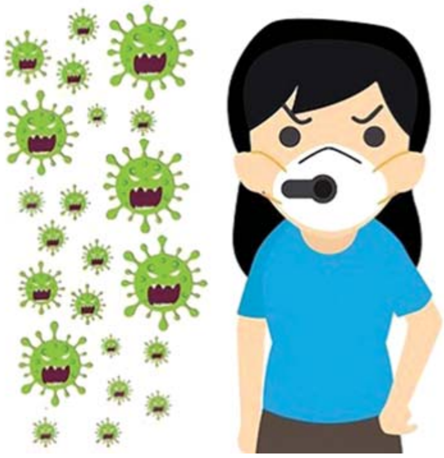

করোনায় নারী ও কিশোরীদের সুরক্ষা

জান্নাতে রোজী

কোভিড-১৯ আমাদের মতো জনবহুল দেশের জন্য এক বড়ো চ্যালেঞ্জ। প্রতিদিনই সংক্রমণ ও মৃত্যুর ঘটনা বাড়ছে। করোনা মহামারির এ সময়ে জনসংখ্যার বিভিন্ন শ্রেণি কিংবা প্রান্তিক মানুষেরা অনেক ঝুঁকি ও আনুষঙ্গিক সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। আর এদের মধ্যে নারী ও কিশোরীরা রয়েছে সবচেয়ে ঝুঁকিতে। ১১ই জুলাই দেশে পালিত হয়েছে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। আর করোনাকালে নারী ও কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'মহামারি কোভিড-১৯ প্রতিরোধ করি, নারী ও কিশোরীদের সুস্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করি'। অর্থাৎ সুরক্ষাহীন নারী ও কিশোরীদের প্রজননস্বাস্থ্য ও অধিকার নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় পর্যায়ে কীভাবে তাদের অধিকতর সুরক্ষা দেওয়া যায়, তা নিয়ে ভাবনা ও যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মহামারিতে নারী ও কিশোরীদের সুস্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে হলে সবার আগে জোর দিতে হবে তাদের প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর। কারণ কম বয়সে বিয়ে, কম বয়সে সন্তান জন্ম দেওয়ার ঘটনায় তাদের প্রজননস্বাস্থ্য আজ সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে।

করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় অনেক শিক্ষার্থী বাল্যবিবাহের শিকার হচ্ছে। অভিভাবকদের যুক্তি, স্কুল বন্ধ থাকার কারণে মেয়েরা পড়াশোনা করে না, মাথায় খারাপ চিন্তা ঢুকবে, পাড়ার উঠতি বয়সের ছেলেদের বেপরোয়া চলাফেরা পারিবারিক সম্মানের ভয়ে বিয়ে দিচ্ছি। তাছাড়া অল্প বয়সে বিয়ে দিলে যৌতুক কম লাগে।

এমন পরিস্থিতিতে ১১ই জুলাই 'কোভিড-১৯ নারী ও কিশোরী স্বাস্থ্য অধিকার সুরক্ষায় করণীয়' শীর্ষক এক ভার্চুয়াল গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় প্রথম আলো ও পপুলেশন সার্ভিসেস অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার এর আয়োজনে। কোভিড-১৯ মহামারিতে বাল্যবিবাহ ও নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে, নারী ও কিশোরীদের অধিকার ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সাহান আরা বানুর মতে, নারী ও কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করতে পুরুষদেরও এগিয়ে আসতে হবে। একই অধিদপ্তরের পরিচালক (মা ও শিশু) মোহাম্মদ শরিফ আলোচনায় অংশ নিয়ে জানান, মাঠ পর্যায়ের অনেক কর্মী কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হলেও সময় মতো মা ও শিশুদের সেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি কিশোর-কিশোরীদের সুরক্ষায় ২৮৫টি উপজেলায় জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে ভার্চুয়াল প্রচার চালানো হচ্ছে।

পপুলেশন কাউন্সিলের এদেশীয় প্রতিনিধি ওবায়দুর রব বলেন, পরিবার ও সমাজের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন না করলে শুধু আইন প্রয়োগ করে বাল্যবিবাহ রোধ করা সম্ভব নয়। ■

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. লাল সবুজের দেশ, ৪. দন্ডধারী, ৫. সূচ, ৬. কোনো একটি বিশেষ শুভ মুহূর্তে যার জন্ম হয়েছে, ৯. সাক্ষী, ১০. লোকালয়

উপর-নিচ: ১. পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি জেলা, ২.আগুন ধরানোর একটি উপাদান, ৩.এক ধরনের বন্যগরু, ৫.শুভ লক্ষণ, ৭.জলাশয়ে উৎপন্ন হয় এমন, ৮.হিংস্র জন্তু, ৯.দীপ্তি

১.			২.		■	■	■
	■	■		■	৩.	■	■
	■	■	৪.				■
	■	৫.		■		■	■
	■		■	■	■	■	■
■	■	৬.		৭.		■	৮.
৯.			■		■	■	
	■	■	■	১০.			

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধাঁ ছক মিলাও। ছকে যে-সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেয়া হল।

সংকেত: কিংকর্তব্যবিমূঢ়, কারণ, বসচা, গরল, উপকরণ, উটচালক, বিবরণ, গরম

				কি				
				ং				
				ক				
				র্ত				
				ব্য				
				বি				
				মূ				
				ঢ়				

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৫	*		-	২	=	
+	■	*	■	*	■	*
	+	২	-		=	৪
-	■	-	■	+	■	-
২	+		-	৩	=	
=	■	=	■	=	■	=
	+	১	+		=	১২

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৬৩		৬৭			৭০	৭		১
	৬৫		৭৩		৭১		৫	
	৬০	৭৫		৮১				৩
৫৮		৭৬			৭৯		১৩	১৪
	৪৪					১১		
		৪৬	৩৭		৩৯		২৫	
	৪৮		৩৬			২৭		
		৫০		৩৪	২৯		২৩	
৫৩	৫২		৩২			২১		১৯

মুজিববর্ষের ঘোষণা

বন্ধুরা, তোমাদের জন্য সুখবর। নবারুণের ‘বুদ্ধিতে ধার দাও’ এতদিন খেলে উত্তর পাঠিয়েছ কিন্তু কোনো উপহার পাওনি। এপ্রিল ২০২০ সংখ্যা থেকে শুরু হয়েছে উপহারের পালা। সঠিক উত্তর দাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ীকে দেওয়া হবে ৫০০ (পাঁচশত) টাকার প্রাইজবন্ড। এজন্য নবারুণ পত্রিকার পাতা (ফটোকপি প্রযোজ্য নয়) পূরণ করে বন্ধ খামে পাঠাতে হবে। খামের ওপর অবশ্যই লিখতে হবে ‘বুদ্ধিতে ধার দাও’। পাঠাবে এই ঠিকানায়—

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

বুদ্ধিতে ধার দাও

জুন ২০২০ -এর সমাধান

শব্দধাঁধাঁ

আ	দ্দি	স	আ	বা	বা		ম
জা			স্কা		গ	ল	দ
র			রা		দা		দ
বা	ল	ক		আ	দ	ব	
ই		লো				ন	
জা		নী	ড়		বি	ভো	র
ন	খ					জ	
			বি	জ্ঞা	প	ন	

ছক মিলাও

				সা				
				লো				
		বা	ল	ক	বে	লা		
		তা		স		ল		
স	হা	য়		ং		মা	নু	ষ
		ন		শ্লে		টি		
			বি	ষ	য়			
				ণ				

ব্রেইনইকুয়েশন

৪	*	২	-	৫	=	৩
+		*		+		+
২	+	১	-	৩	=	০
-		+		-		+
১	*	৪	-	২	=	২
=		=		=		=
৫	+	৬	-	৬	=	৫

নাম্ব্রিক্স

৩	২	১	৭৬	৭৭	৭৮	৬৩	৬২	৬১
৪	৯	১০	৭৫	৮০	৭৯	৬৪	৬৫	৬০
৫	৮	১১	৭৪	৮১	৭০	৬৯	৬৬	৫৯
৬	৭	১২	৭৩	৭২	৭১	৬৮	৬৭	৫৮
১৯	১৮	১৩	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৫৭
২০	১৭	১৪	৩৯	৩৪	৩৩	৪৬	৪৫	৫৬
২১	১৬	১৫	৩৮	৩৫	৩২	৪৭	৫৪	৫৫
২২	২৫	২৬	৩৭	৩৬	৩১	৪৮	৫৩	৫২
২৩	২৪	২৭	২৮	২৯	৩০	৪৯	৫০	৫১

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য
ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
যান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

সচিত্র বাংলাদেশ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন। লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট ও গ্রাহকগণ নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্যভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

Regd, Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-45, No-1, July 2020, Tk-20.00

র্বষায় মাছ ধরার আনন্দই আলাদা। মৌসুম শুরু হলেই মাছ ধরার ধুম পরে যায়। দিন কিংবা রাতে সবাই মনের আনন্দে মাছ ধরতে যায় দলবেঁধে। জাল ভরা মাছ দেখে খুশিতে নেচে উঠে জেলেদের মন। এই আনন্দ ছড়িয়ে যায় এক নৌকা থেকে আরেক নৌকায়।

DFP

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্যভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা